

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দিনে ডাকাতি



দিনে ডাকাতি

টেবিলের ওপর ভাত দেওয়া হয়েছে। খেয়েদেয়ে বিমান কলেজ যাবে। বিমানের বাবার খাওয়া হয়ে গেছে আগেই, তাঁর এক্ষুনি অফিসে বেরিয়ে যাবার কথা। কে একজন লোক এই সময় বাবার সঙ্গে দেখা করতে এলো। আর একটা কাক বিমানের ভাতের থালায় সেই সময়েই মুখ দিয়ে গেল।

লোকটি যদি আর কিছুক্ষণ বাদে আসতো কিংবা পাজী কাকটা যদি বিমানের ভাতের থালায় ঠোক্কর না মারতো, তাহলে পরের গল্পটা

কিছুই হতো না।

কলিং বেলের আওয়াজ শুনে বিমানই ভাতের থালা ফেলে উঠে গিয়েছিল দরজা খুলে দিতে। বারান্দায় ওঁত পেতে ছিল কাকটা। দস্যুর মতন এসে থালা থেকে মাছভাজাটা তুলে নিয়ে গেল। শুধু তাই নয়, অনেকগুলো ভাত ছড়িয়ে প্রমানও রেখে গেল তার কুকীর্তির।

ফিরে এসে বিমান এই কাণ্ড দেখে রেগে আগুন। তাড়া করে গেল কাকটাকে। কাকটা বারান্দাতেই বসে মাছভাজাটা আরাম করে খাচ্ছিল। বিমানকে দেখে টুক করে উড়ে গিয়ে বসল রাস্তার লাইট পোস্টের ওপর। সেখান থেকে বিমানকে দেখিয়ে দেখিয়ে মাছভাজাটা শেষ করতে লাগলো।

বিমান একটা ইঁটের টুকরো ছুঁড়ে মারলো কাকটার দিকে। গায়ে লাগলো না। কাকটা সেখানেই বসে রইলো। বিমানকে সে গ্রাহ্যও করছে না।

বারান্দার দেওয়ালের একটা কোণ ভেঙে আছে অনেকদিন ধরে। সেই জায়গাটা আরও ভেঙে, আরও কয়েকটা ইঁটের টুকরো নিয়ে বিমান মারতে গেল কাকটাকে। একটাও লাগলো না। নীচের রাস্তা থেকে কে একজন চেঁচিয়ে বললো, "কী, হচ্ছে কী? কে ইঁট ছুঁড়ছে?"

বোধহয় রাস্তায় কারুর গায়ে লেগেছে। অসম্ভব মোটা গলা লোকটার। বিমান তাড়াতাড়ি বসে পড়লো, যাতে তাকে দেখতে পাওয়া না যায়। রাগের চোটে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, একদিন সে পৃথিবী থেকে সব কাকদের ধ্বংস করবে।

নীচের লোকটা হেঁড়ে গলায় আবার চিৎকার করলো, "কী হচ্ছে কী? অ্যাঁ? কী হচ্ছে কী?" বিমান টপ করে ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে।

কাকে যে ভাতে মুখ দিয়েছে, সে ভাত আর খাওয়া যায় না। সবটা ফেলে দিয়ে নতুন থালায় আবার তাকে ভাত দেওয়া হলো।

কিন্তু মাছ আর নেই। মাছ ছাড়া বিমান মোটেই ভাত খেতে পারে না। সুতরাং আবার মাছ ভাজা হচ্ছে। কলেজের দেরি হয়ে গেল বিমানের। একটা ক্লাস করা হবে না।

বসবার ঘরে বাবা সেই লোকটার সঙ্গে কথা বলছিলেন। নিশ্চয়ই কোন জরুরী কথা, কেননা, বাবা কখনো অফিসে যেতে দেরি করেন না বিমানকে দেখে বাবা বললেন, "তুই এখনো কলেজে যাসনি? তা হলে আমার একটা কাজ করে দে তো! একবার ব্যাঙ্ক থেকে ঘুরে আয়, আমার আজ বেরুতে দেরি হবে।"

বাবা বিমানকে একটা এক হাজার টাকার চেক লিখে দিয়ে বললেন, "এটা তুলে এনে তুই আমাকে পৌঁছে দিয়ে তারপর কলেজে যা। টাকাটা সাবধানে রাখবি কিন্তু। বাসে-ট্রামে উঠিস না। হেঁটেই আসিস বরং।"

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা-টোলার ব্যাপারগুলো বাবা নিজেই করেন, বিমানকে কখনো যেতে হয় না! ঐ লোকটি না এলে বাবা অফিসে বেরিয়ে যেতেন। কাকটা ভাতে মুখ না দিলে বিমানও কলেজে চলে যেত এতক্ষনে তা হলে আর তাকে ব্যাঙ্কে যেতে হতো না।

চেকটা সাবধানে বুক-পকেটে রেখে বিমান বাসেই উঠলো। আসবার সময় না-হয় টাকাটা নিয়ে হেঁটেই আসবে। অবশ্য তখন বাসে ফিরলেও ক্ষতি নেই। টাকাটা কি কেউ বিমানের কাছ থেকে নেবে নাকি? বাড়ি থেকে বাসের চারটে স্টপ দূরেই ব্যাঙ্ক।

যাক, ব্যাঙ্কে আজ বেশী লোকের ভিড় নেই। বিমান চেকটা জমা দিয়ে একটা পেতলের চাকতি হাতে নিয়ে বসে রইলো। আরও কয়েকজন লোক অপেক্ষা করছে। সবাই গম্ভীর। ব্যাঙ্কে যারা টাকা জমা দিতে কিংবা তুলতে আসে, তারা সবাই গম্ভীর হয়েই থাকে, বিমান আগেও লক্ষ্য করেছে।

একজন মোটা মতন ভদ্রমহিলা শুধু কথা বলছেন কাউন্টারে

দাঁড়িয়ে। তাঁর চেকে সই মেলেনি। মহিলা বেশ রেগে-মেগে বলছেন, "বাঃ, আমার নিজেরই সই, অথচ মেলেনি, তার মানে কী ?"

কাউন্টারের লোকটা বললো, "মিলছে না, তা আমি কী করবো বলুন ! তিনবার সই করলেন, তিনটেই অন্যরকম !"

মহিলা বললেন, "তা হলে আমার টাকা কি অন্য লোকে তুলবে ? যদি কোনদিনই আমার সই না মেলে ?"

বিমান ভাবলো, ভদ্রমহিলা বোধহয় আগে খুব রোগা ছিলেন। তখন তাঁর সই অন্যরকম ছিল।

এই সময় বিমানের নম্বর ডাকা হলো। পেতলের চাক্তিটা ফেরত দিয়ে বিমান টাকাগুলো নিয়ে গুনছে, ঠিক তখনই কাণ্ডটা ঘটলো।

একটা প্রচণ্ড চিৎকার শোনা গেল, "আরে ইয়ে কেয়া হ্যায় ? ছোড় দো…বিষেণ সিং, বিষেণ সিং…বড়েবাবু, বড়োবাবু, হোঁশিয়ার—আঁক্…"

চিৎকারটা এলো দরজার কাছ থেকে। বিমান সেখান থেকে অনেকটা দূরে। বিমান টাকাগুলো মুঠোয় চেপে ধরে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, একজন লম্বা চেহারার লোক ব্যাঙ্কের দারোয়ানের হাতের বন্দুকটা চেপে ধরেছে আর দারোয়ান ঐ রকম চ্যাঁচাচ্ছে। তারপরেই মুখে রুমাল বাঁধা আর একজন লোক একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মারলো দারোয়ানের মাথায়। দারোয়ানটি শেষ মুহূর্তে বন্দুকটা প্রায় ছাড়িয়ে এনেছিল, কিন্তু মাথায় ডাণ্ডার বাড়ি খেয়ে সে আর কিছুই করতে পারলো না, ঝুপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

এর মধ্যেই দরজার কাছে আরও দু'জন লোক এসে দাঁড়িয়েছে, দু'জনের হাতেই রিভলবার। তাদের চোখের তলা থেকে মুখের সবটা একটা কালো কাপড়ে ঢাকা। আগের দু'জনের মুখও ঐরকম ঢাকা ছিল।

রিভলবারধারী লোক দুটির মধ্যে একজন কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বললো, "যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।

একটু নড়লেই খতম করে দেবো।"

সবাই ছবির মানুষের মতন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। শুধু মোটা মহিলা বলে উঠলেন, "ওরে বাবারে! ওরে বাবারে!"

তারপর একজনের রিভলবারের মুখ তাঁর দিকে ফিরতেই তিনি আবার বললেন, "না, না, চুপ করছি! চুপ করছি!"

বিমানের টাকা গোনা আর হল না। সব টাকা একসঙ্গে প্যান্টের পকেটে ভরে ফেললো। তারপর দাঁড়ালো দেয়াল ঘেঁষে। তার বুকটা অসম্ভব জোরে কাঁপছে। ডাকাতরা কি তার টাকাটাও কেড়ে নেবে?

রিভলবারধারী দু'জনের মধ্যে একজন চলে এলো টাকার কাউন্টারের দিকে। আর একজন চলে গেল ভেতরে। সেখানে সে রিভলবারটা চারদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে বলতে লাগলো, "কেউ নড়বে না, ম্যানেজার কই? ম্যানেজার? চাবি?"

লম্বা ডাকাতটা দারোয়ানের বন্দুকটা তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছেই। লোহার ডাণ্ডাওয়ালা লোকটা পোস্ট অফিসের চিঠির থলির মতন একটা থলি নিয়ে এদিকে এগিয়ে এলো। কাউন্টারের দু'জন লোকই কাঁপতে কাঁপতে রাশি রাশি টাকা ভরে দিতে লাগলো সেই থলির মধ্যে।

মোটা মতন মহিলাটি অসম্ভব ঘামছিলেন। হঠাৎ-খুব জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগলেন। ফিসফিস করে বললেন, "আমার হার্ট খুব উইক!" তারপরই ধপাস করে পড়ে গেলেন অজ্ঞান হয়ে—মাটিতে নয়, কাছাকাছির বেঞ্চির ওপর। বিমান নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইলো, সাহায্য করতে যেতে সাহস পেল না। তার নিজেরও বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে শব্দ হচ্ছে অনবরত। খুব যে ভয় পেয়েছে, তা নয়। খালি একটা উত্তেজনা, এর পর কী হবে? এর পর কী হবে?

এক মিনিট দেড় মিনিটের মধ্যে ডাকাতরা কাজ শেষ করে

ফেললো। ব্যাঙ্কে সেদিন অনেক বেশী টাকা ছিল, তারা বোধহয় আগে থেকেই খবর পেয়েছিল। তারা হয়তো একথাও জানতো যে, ব্যাঙ্কের দু'জন দারোয়ানের মধ্যে একজন সেই সময় থাকবে না।

ব্যাঙ্কের একজন কর্মচারী ভয় পেয়ে কিংবা যে-কারণেই হোক টেবিলের তলায় লুকিয়ে পড়েছিল। ডাকাতেরা কাজ সেরে চলে যাবার সময় বিনা কারণেই তাকে কয়েকটা লাথি মেরে বললো, "দূর কুত্তার বাচ্চা!"

বিমানের যেন মনে হলো এই গলার আওয়াজটা একটু চেনা-চেনা। কোনো চেনা লোকের নয়, একটু আগেই কোথায় যেন শুনেছে। খানিকটা আগে সে যখন কাকের দিকে ইট ছুঁড়ছিল, তখন রাস্তা থেকে যে লোকটা বলেছিলো, 'কী হচ্ছে কী?'—অনেকটা সেই রকম।

ডাকাতেরা হুড়দাড় করে বেরিয়ে যাবার পরও কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ করে রইল হতভম্বের মতন। সবচেয়ে আগে গলা শোনা গেল সেই মোটা মহিলার। তিনি আসলে অজ্ঞান হননি। তাঁর গলায় সোনার হার ছিল বলেই তিনি অজ্ঞান হবার ভান করে সেটাকে লুকিয়েছিলেন। এবার চোখ খুলেই তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "পুলিশ! পুলিশ! শিগগির পুলিশে খবর দিন!"

তখন অনেকে মিলে ছুটলো দরজার দিকে। বিমানও ছুটলো। ডাকাতরা তখন একটা কালো রঙের গাড়িতে উঠছে। কয়েকজন রাস্তায় বেরিয়ে চেঁচাতে লাগলো বিমান কিন্তু রাস্তায় গেল না। সে দেখতে পেল দারোয়ানটা হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে মাটিতে, মাথা দিয়ে গল্ গল্ করে রক্ত বেরুচ্ছে। এক্ষুনি রক্ত বন্ধ না করলে লোকটাকে বাঁচানো যাবে না। অথচ তাকে এখনো কেউ দেখছেই না।

বিমান সেখানেই বসে পড়ে পকেট থেকে রুমালটা বার করে চেপে ধরলো লোকটির মাথায়। লোকটি শব্দ করলো, "ওহ!" যাক। লোকটি তাহলে এখনো বেঁচে আছে। একে এক্ষুনি এখান

থেকে সরানো দরকার। ব্যাঙ্কে যদি ফার্স্ট এডের কিছু জিনিসপত্র থাকে—

বিমান আর কিছুই করার সুযোগ পেল না। যে-সব সাহসী লোকেরা ডাকাতদের তাড়া করে রাস্তায় ছুটে বেরিয়েছিল, তারা আবার হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে এলো। দারোয়ানের শরীরটা মাড়িয়ে, বিমানকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তারা জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে। বিমান উঠে দাঁড়াতেও পারলো না, বাইরে দুম্ দুম্ করে দুটো শব্দ হলো। তারপর একটা বোমা এসে লাগলো বিমানের গায়ে।

বিমানও ঢলে পড়লো দারোয়ানের পাশে।

॥ দুই ॥

বিমান ব্যাঙ্ক থেকে অনেকক্ষণ ফিরছে না বলে তাঁর বাবা এক সময় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পাটনা থেকে একজন লোক একটা জরুরী খবর এনেছে। আজ রাত্রেই তাঁকে জরুরী কাজে পাটনা যেতে হবে। বিমানকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা তুলে আনতে বলা হলো, তবু সে ফিরছে না কেন? ও কি ভুল বুঝলো? টাকাটা নিয়ে ওখান থেকে কলেজে চলে গেল?

বাবা টেলিফোন করলেন ব্যাঙ্কে। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কেউ টেলিফোন ধরছেই না; ব্যাপার কী? বাবা ব্যস্ত হয়ে ছটফট করছেন, নিজেই বেরুবেন ভাবছেন। এমন সময় হাসপাতাল থেকে টেলিফোন এলো—এক্ষুনি চলে আসুন।

বিমানের মাথা আর পুরো হাতখানা জুড়ে বিরাট ব্যাণ্ডেজ। ভালো করে জ্ঞান ফেরেনি; মাঝে মাঝে চোখ খুলে কিছু একটা বলতে চাইছে, আবার কেমন ঢলে পড়ছে।

বাবা, মা, ছোট মামী, জামাইবাবু বিমানের খাট ঘিরে বসে রইলেন। ডাক্তার এসে বলে গেলেন, চিন্তার কিছু নেই তবু শান্ত হতে পারছেন না ওঁরা।

চোখ-বোজা অবস্থাতেই বিমান কী যেন বলছে বিড়বিড় করে। তারপর চোখ মেলে কাকে যেন খুঁজছে।

মা ঝুঁকে এসে বললেন, "কী রে, খোকন? কষ্ট হচ্ছে?"

বিমান বললো, "না।"

বাবা বললেন, "বিশেষ কিছু হয় নি। ডাক্তার বলছেন, দু'এক দিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবেন।"

বিমান আবার ঠোঁট নেড়ে কী যেন বলতে চাইলো। তাকে দেখে মনে হয়, খুব চিন্তিত।

বাবা বললেন, "আমাদের টাকাটা সবটাই পাওয়া গেছে তোর প্যান্টের পকেটে ছিল।"

বিমান এবার পরিষ্কার ভাবে বললো, "সে কোথায়?"

"কে? কে?"

"সেই লোকটা?"

"কোন লোকটা?"

"সেই লোকটা। যে আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল?"

মা বললো, "আমরাই তো দাঁড়িয়ে আছি। আর ডাক্তারবাবু এসেছিলেন দু'বার।"

বিমান মাথা নেড়ে বললো, "না।"

বাবা-মা-ছোটমামী-জামাইবাবু পরস্পরের দিকে চিন্তিতভাবে তাকালেন।

বিমান একটুখানি ভেবে নিয়ে বললো, "ব্যাঙ্কের সেই দারোয়ান!"

এই সময় নার্স এসে বকুনি দিয়ে বললো, "আপনারা পেসেন্টকে দিয়ে এত কথা বলাচ্ছেন কেন? এখন ঘুমোতে দিন। আবার বিকেলে আসবেন। আমি এখন ওষুধ খাওয়াবো।"

ওষুধ খেয়ে বিমান আবার ঘুমিয়ে পড়লো। বাবা-মায়েরা আর একটু অপেক্ষা করে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজারও এসেছিলেন বিমানকে দেখতে। তিনিও বিমানের সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারলেন না, দূর থেকে দেখে গেলেন। তারপর বাবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে নামতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে।

ম্যানেজার বললেন, "একটা ব্যাপারে আপনার খুশী হওয়া উচিত। এরকম ছেলে আজকাল খুব কম দেখা যায়।"

বাবা চুপ করে রইলেন।

ম্যানেজার আবার বললেন, "ব্যাঙ্কের দারোয়ানটা মাটিতে পড়ে ছিল, মাথা দিয়ে গল্ গল্ করে রক্ত বেরুচ্ছে—কেউ তাকে দেখেনি—সবাই নিজেকে সামলাতেই ব্যস্ত। তখন আপনার ছেলেই তাকে বাঁচাতে গিয়েছিল। এমন সাঙ্ঘাতিক ডাকাতির পরেও কি কেউ মাথা ঠিক রাখতে পারে? আমার তো ভয়ে হাত-পা এমন কাঁপছিল..."

"ক'জন ডাকাত ছিল?"

"চারজনকে তো দেখলুম, আরও ছিল কিনা কে জানে। দু'হাতে বোমা আর স্টেনগান—দেখলেই গা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। একটা দারোয়ান বিষণ সিং আবার সেই সময়েই দোকানে গিয়েছিল খৈনি না কি কিনতে, একটা মোটা দারোয়ান, তাও হাতে মান্ধাতার আমলের বন্দুক।"

"কী হলো সেই দারোয়ানের?"

"সেই কথাই তো বলছি। মাথাটা তার একেবারে ফাঁক করে দিয়েছে। আমরা যখন গেলাম, তখনও দেখলাম, আপনার ছেলে এক হাতে রুমাল নিয়ে দারোয়ানটার মাথা চেপে ধরে আছে। বোমাটা না লাগলে হয়তো..."

"দারোয়ানটা বেঁচে আছে তো?"

"নাঃ! হাসপাতালে আনবার আগেই···বলতে গেলে আপনার ছেলের হাতে মাথা রেখেই সে মারা গেছে। তবু তো বেচারী শেষ মুহূর্তে অন্তত একজনের সেবা পেয়েছিল।"

আটদিন বাদে বিমান হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল। তার মাথার চোটটা বেশী কিছু না। শুকিয়ে এসেছে এরই মধ্যে। কিন্তু ডান হাত জুড়ে বিরাট প্লাস্টার করা। আরও অন্তত একমাস ঐ রকম থাকবে।

ডাকাতরা সেদিন ব্যাঙ্ক থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়েছে। আজও তাদের ধরা যায়নি। পুলিশ কোনো খোঁজই পায়নি।

ব্যাঙ্কের দারোয়ান বুধ সিং যে মারা গেছে, সে-কথা বিমানকে বেশ কিছুদিন জানানো হয় নি। কারণ বিমান প্রায়ই তার কথা জিজ্ঞেস করতো। হঠাৎ মনে আঘাত পেলে যদি ক্ষতি হয় সেইজন্য তাকে বলা হয়েছিল' বুধ সিং ভালো আছে, তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে।

বাড়িতে আসবার পর একদিন ছোট মাসী সত্যি কথাটা বলে ফেললো। ছোট মাসী একদম মিথ্যে কথা বলতে পারে না কিনা!

খবরটা শুনে বিমান খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। বুধ সিং নামে এই দারোয়ানটার রক্তমাখা মুখটা তার চোখের সামনে ভাসে। দারুণ অবাক হবার মতন চোখ দুটো বড় বড় করে মেলে ছিল লোকটা। ও কি ভেবেছিল তক্ষুনি মরে যাবে?

একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে বিমান বললো, "একটা আশ্চর্য ব্যাপার কী জানো ছোটমাসী? হাসপাতালে আমি যখন অজ্ঞান হয়ে ছিলাম, ঠিক অজ্ঞান নয়, একটু একটু জ্ঞান ছিল, সেই সময় চোখ মেলে একবার দেখলাম, ঐ বুধ সিং আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে হাত জোড় করে বললো, বাবুজী, আপনি আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। আমি ভাবলাম, যাক্, লোকটা তাহলে বেঁচে গেছে। কিন্তু লোকটা যদি মরেই গিয়ে থাকে, তা হলে আমি

ওরকম দেখলাম কেন ?"

ছোটমাসী বললেন, "ওরকম হয়। অসুখের সময় কিংবা জ্বরের ঘোরে মানুষ অনেক সময় ওরকম স্বপ্ন দেখে।"

"স্বপ্ন নয়, চোখ মেলে দেখেছি।"

"তুই ভাবছিস তাই! আসলে স্বপ্নই দেখেছিলি।"

"এ আবার কী অদ্ভুত স্বপ্ন। একটা লোক মরে গেছে, আর স্বপ্নে দেখলাম, সে এসে বলছে, আমি বেঁচে গেছি!"

স্বপ্নে কত অদ্ভুত ব্যাপার হয়। তোকে আর ও নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।"

বিমান আবার চোখ বুজলো। আবার সে দেখতে পেল বুধ সিং-এর রক্ত-মাখা মুখটা। ইস্, লোকটা এমনি এমনি মরে গেল! তিরিশ-বত্রিশ বছর বয়স ছিল মাত্র, ভালোমানুষ ধরনের চেহারা। লোকটা কোনো দোষ করেনি কারুর কাছে, কলকাতায় চাকরি করতে এসেছিল, অকারনে প্রাণটা চলে গেল। এর কোনো মানে হয়?

কয়েকদিন বাদে বিমান বুধ সিংয়ের কথা আস্তে আস্তে ভুলে যেতে লাগলো। এখন তার বেশী চিন্তা নিজের ডান হাতখানা নিয়ে। হাতটা পুরোপুরি সারবে তো? বিমান খুব ভালো সাঁতার কাটে। ইন্টার-কলেজ সুইমিং-এ সে গত বছরেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এ বছর বাঙ্গালোর কমপিটিশনে তার যাবার কথা। তার দেরি আছে অবশ্য, কিন্তু হাতটা পুরোপুরি না সারলে সে সাঁতার কাটবে কী করে?

প্লাসটার করে হাতখানা দারুন ভারী। মাঝে মাঝে ভেতরটা চুলকোয়। কিন্তু চুলকোবার তো কোনো উপায় নেই। খুব খারাপ লাগে তখন। তা ছাড়া বাঁ হাতে চামচ দিয়ে ভাত খেতে হয়, তাও কি ভাল লাগে কারুর! রাগে দুঃখে বিমানের মন-মেজাজ বিগড়ে থাকে। সে কি কোনো দোষ করেছিল? শুধু-শুধু কয়েকটা ডাকাত তার হাতটা ভেঙে দিয়ে যাবে? ডাকাতরা কি যা খুশি

তাই করবে নাকি ?

বারান্দায় একটা কাক বিশ্রী গলায় ডাকছে কা-কা করে। কিন্তু বিমান কাকদের এখন অনেকটা ক্ষমা করে দিয়েছে। এখন তার ইচ্ছে করে, পৃথিবী থেকে সব ডাকাতদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে।

এক মাস বাদে বিমানের হাতের প্লাস্টার কেটে ফেলা হলো। কী বিশ্রী হলদেটে রং হয়ে গেছে হাতটার। জোর যেন কমে গেছে অনেকখানি। একবার গরম জলে একবার ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রাখা হলো হাতটা। এই রকম বেশ কয়েকবার। তারপরে মনে হলো আস্তে আস্তে জোর ফিরে আসছে। সেদিন ভাত খেতে বসে বিমানের মনে হলো, যেন সে এক যুগ বাদে আবার নিজের হাতে মাছের কাঁটা বেছে খাচ্ছে।

কিন্তু সাঁতার না কাটলে বোঝা যাবে না, সত্যিই হাতের সবটা জোর ফিরে এসেছে কিনা। পরের দিনই বিমান সাঁতার কাটতে গেল।

বাড়ির খুব কাছেই লেক। ভোরবেলাতেই অনেকে সাঁতার কাটতে আসে। অনেকেই বিমানকে চেনে। বিমান কিন্তু কারুর সঙ্গে বিশেষ কথা বললো না। আগে তাকে একলা-একলা সাঁতার কেটে দেখতে হবে, তার ফরম ঠিক আছে কিনা।

জলে নেমে বিমান দেখলো তার কোনো অসুবিধে হলো না হাত দুটো ঠিকই চলছে। তবে স্পীড আগের মতন আছে কিনা সেটা এক্ষুনি বোঝা যাবে না।

ছোট লেকটাকে দু-তিনবার এপার ওপার করা বিমানের পক্ষে কিছুই না। আগে সে প্রত্যেকদিনই করেছে। আজও বিমান খুব সহজ ভাবে এপারে চলে এলো। তারপর একটুও বিশ্রাম না নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। খানিকটা এসেই কিন্তু খুব ক্লান্ত লাগলো। মনে হচ্ছে যেন ডান হাতটা অসাড় হয়ে আসছে। এবার আর পার

হতে পারবে না। এখনো অনেকটা। ফিরে যাবে?

ঠিক তখনই কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো, "বড়েবাবু, বড়েবাবু, হোঁসিয়ার!"

বিমান চমকে ঘাড় ফেরালো। কে চীৎকার করলো ওরকমভাবে? লেকের এদিকটায় তো কোনো লোক নেই। অথচ বিমান পরিষ্কার শুনেছে। গলার আওয়াজটা কার মতন? কার মতন! ঠিক ব্যাঙ্কের দারোয়ান বুধ সিংয়ের মতন। কে এখানে ঐরকমভাবে চেঁচাবে? এখানে তো কেউ নেই!

বিমানের সারা শরীরটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠলো।

বিমানের এক মাসতুতো দাদা পুলিশে কাজ করে। তার নাম প্রিয়ব্রত দত্ত। মাঝে মাঝে আসে এ-বাড়ীতে। পুলিশের কাজ করলেও প্রিয়ব্রত কবিতা লেখে আর ভালো গান করে। প্রিয়ব্রত এ-বাড়িতে এলে কবিতা-আবৃত্তি করে ও গান গেয়ে একেবারে জমিয়ে দেয়।

সেদিন প্রিয়ব্রত এসেছে এ-বাড়ীতে। বিমান খানিকক্ষণ বিদ্রূপ করে বললো, "তোমরা পুলিশরা কী! এখনো ডাকাতদের ধরতে পারলে না?"

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে প্রিয়ব্রত বললো, "ও ঠিক ধরা পড়ে যাবে!"

বিমান বললো, "ছাই ধরা পড়বে! দেড় মাস হয়ে গেল। সব টাকা ওরা এতদিনে খরচ করে ফেলেছে!"

প্রিয়ব্রত বললো, "সাড়ে তিন লাখ টাকা খরচ করা কি সোজা কথা! তা ছাড়া ওদের মধ্যে একটা ঝগড়া লাগবেই।"

"কেন, ঝগড়া লাগবে কেন?"

"যারাই দল বেঁধে ডাকাতি করে, তারাই টাকার ভাগাভাগির সময় ঠিক ঝগড়া করে। অনেকবার দেখা গেছে।"

"কিন্তু চারজন ডাকাত যদি টাকাগুলো সমান ভাগে ভাগ করে নেয়?"

"তা হয় না। প্রত্যেকেই ভাবে সে অন্যদের থেকে বেশী সাহস দেখিয়েছে, তাই সে বেশী টাকা পাবে। এর পরেই ঝগড়া লাগে। পাপের টাকা কি ভালো-ভাবে ভোগ করা যায়?"

বিমান বললো, "এসব তোমাদের পুরোনো থিয়োরি। আজকালকার ডাকাতরা অনেক বেশী চালাক। যাই বলো, তোমাদের ক্যালকাটা পুলিশ আজকাল আর খুনী বা ডাকাতদের ধরতে পারে না। শুধু পারে ছাত্রদের মিছিলের ওপর লাঠি চালাতে!"

প্রিয়ব্রত হেসে উঠলো। তারপর বললো, "আজকাল আর সে-যুগও নেই। যাকগে, ওসব কথা, তোর হাতটা সেরে গেছে পুরোপুরি? মার তো আমার কাঁধে একটা ঘুষি, দেখি কি রকম জোর হয়েছে!"

বিমান ডান হাতটা মুঠো করে একটা দারুন ঘুষি কষালো। প্রিয়ব্রত একটুও নড়লো না। একটা গাছের মতন স্থির হয়ে রইলো। বিমান একটু অবাক হয়ে গেল। তাহলে কি তার ডান হাতে সত্যিই জোর কমে গেছে? এবার সে একটা বাঁ হাতে ঘুষি ঝাড়লো। এবারেও সে প্রিয়ব্রতকে একটুও টলাতে পারলো না।

প্রিয়ব্রত মিটি মিটি হাসছে। বেশ লম্বা চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল, পাঞ্জাবি আর পা-জামা পরা অবস্থায় তাকে একটুও পুলিশের মতন দেখায় না, কবি-কবিই মনে হয়। কিন্তু তার গায়ে অসম্ভব জোর? মাস্‌লগুলো লোহার মতন শক্ত।

প্রিয়ব্রত বললো, "এবার আমি একটা মারবো?"

বিমান পা দুটো ফাঁক করে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে বললো, "মারো!"

কী অসম্ভব তাড়াতাড়ি হাত চালায় প্রিয়ব্রত। ঘুষি খেয়ে বিমান একেবারে ছিটকে পড়ে গেল ঘরের কোণে। অবাক হয়ে বললো, "এ কি প্রিয়দা, তুমি যে আমাকে মেরে ফেলেছিলে আর

একটু হলে !"

প্রিয়ব্রত এগিয়ে এসে বিমানের হাত ধরে টেনে তুলে বললো, "আর পুলিশের নিন্দে করবি ?"

বিমান বললো, "শুধু গায়ের জোর থাকলেই পুলিশ হওয়া যায় না। একটু বুদ্ধিও থাকা দরকার।"

প্রিয়ব্রত হাসছে। দরজার দিকে একবার চেয়ে দেখলো, বিমানের বাবা কাছাকাছি আছেন কিনা। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, "দেখিস, ঐ ডাকাতগুলোকে শেষ পর্যন্ত আমিই ধরবো।"

বিমান এবার উৎসাহিত হয়ে বললো, "সত্যি প্রিয়দা, তোমার ওপরেই এই কেসটার ভার পড়েছে নাকি ?"

"একটা স্পেশাল স্কোয়াড তৈরি করা হয়েছে। আমিও তার মধ্যে আছি।"

"আচ্ছা, এই ধরনের ডাকাতিগুলো থেকে কী করে সূত্র পাও তোমরা ? ডাকাতদের মুখ কেউ দেখেনি, ডাকাতরা কিছু ফেলেও যায়নি, কোনো সূত্রই নেই, কী করে ধরবে ?"

"তবু ঠিকই ধরা পড়ে।"

"কী করে সূত্র পাও, বলো না ! ওরা যদি ডাকাতি-টাকাতি একদম ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোক সেজে যায়, কী করে কলকাতায় এত লোকের মধ্যে থেকে খুঁজে বার করবে ?"

"কোন ডাকাতই আর বাকী জীবনে পুরোপুরি সাধারণ মানুষ হতে পারে না। আমাদের ইনফর্মার ছড়ানো আছে বিভিন্ন পাড়ায়। কোথাও যদি দেখা যায় কোনো হঠাৎ-নবাব দু'হাতে টাকা খরচ করছে, তাহলেই ইনফর্মাররা এসে আমাদের খবর দেবে।"

"যদি তারা কলকাতাতেই আর না থাকে ?"

"তারও উপায় আছে। তাছাড়া বললুম না, ওদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয়। হঠাৎ দেখা যাবে, দমদম বা বেলঘরিয়ার দিকে

রেল-লাইনের পাশে একটা লোকের মৃতদেহ পড়ে আছে। কাগজে এরকম খবর দেখিস না?"

"হ্যাঁ, দেখি।"

"এ ওদের নিজেদের মধ্যে মারামারির ফল। দলের লোকই একজন মেরে এরকম ফেলে রেখে যায়। সেই ডেড বডিটাকে সনাক্ত করতে পারলে বাকী দলটাকে ধরা শক্ত হয় না। তবে আমার মনে হয়, এদের এখনো সে সময় আসেনি।"

"কেন?"

"পরশুদিন অসানসোলে একটা গয়নার দোকানে ডাকাতি হয়েছে, নব্বুই হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে। সেখানেও চারজন ডাকাত ছিল, মুখে কালো কাপড় বাঁধা। এরাও কোনরকম ভুল করেনি। যাবার সময় বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়েছে। আমার মনে হয়, এটাও ঐ একই দলের কাজ। এখনো পর্যন্ত ওরা কোনো ভুল করেনি বলে ওদের সাহস আরও বেড়ে যাবে। ওরা আরও দু-এক জায়গায় চেষ্টা করবেই। তার আগে ওদের ঝগড়াও হবে না।"

বিমান উত্তেজিতভাবে বললো, "তার মানে ওরা কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে?"

প্রিয়ব্রত বললো, 'তার কোনো মানে নেই। কলকাতা থেকে অসানসোল যাতায়াত করতে একদিনও লাগে না। কলকাতা শহরটাই লুকিয়ে থাকার পক্ষে সবচেয়ে ভালো জায়গা। আচ্ছা এবার বল তো ডাকাতগুলোকে দেখতে কী রকম ছিল?"

এ সম্পর্কে বিমান অনেকবার বলেছে। তবু তার আপত্তি নেই। সে বললো, "আমি ওদের মুখ দেখেনি। কালো কাপড় দিয়ে মুখ বাঁধা ছিল।"

প্রিয়ব্রত ফস্ করে পকেট থেকে একটা কালো কাপড়ের টুকরো বার করে নিজের মুখটা বেঁধে ফেললো। তারপর বললো, "এই রকম?"

২

বিমান বললো, "হ্যাঁ।"
'এখন আমাকে চেনা যাচ্ছে ?"
"বাঃ, আমি তো তোমাকে জানি বলেই…"
"অন্য লোক আমাকে এখন চিনতে পারবে ?"
"না।"



"আমার চোখের দিকে ভালো করে তাকা। তাকিয়েছিস ? এবার—"

প্রিয়ব্রত মুখ থেকে কালো কাপড়টা সরিয়ে নিল। বিমানকে বললো, "এবার দেখ তো চোখ দুটো চিনতে পারছিস কিনা? সব মানুষেরই চোখের গড়ন আলাদা।"

বিমান বললো, "হ্যাঁ, চিনতে পারছি।"

"কোনো ডাকাতের চোখ এরকমভাবে লক্ষ্য করেছিলি?"

সে-রকমভাবে তো দেখিনি। একজন ডাকাতই শুধু আমার খুব কাছ দিয়ে কাউন্টারের দিকে গিয়েছিল, তাকে দেখেছিলাম, কিন্তু আবার দেখলে চিনতে পারবো কিনা জানি না।"

"যখনই সময় পাবি, সেই চোখ দুটোর কথা চিন্তা করবি! যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কোনো আলাদা কিছু—। যাক্, এবার বল, ওদের চেহারাগুলো কী রকম।"

"ওরা ছিল চারজন।"

"না পাঁচজন।"

"পাঁচজন কে বললো? চারজনই তো ছিল।"

"উঁহু! একজন গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে বসে ছিল। ট্যাক্সি না, প্রাইভেট গাড়ি তাহলে সেও ডাকাতদেরই দলের।"

"তাকে আমি দেখিনি।"

"তুই যাদের দেখেছিস, তাদের কথাই বল্।"

"যে ব্যাঙ্কের দারোয়ানের কাছ থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিচ্ছিল, সে বেশ লম্বা, চওড়াও কম নয়—বেশ বড়সড় চেহারা, মাথার চুল থাক-থাক করা। আর যে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মারলো, সে বেশ মোটা মতন, কিন্তু খুব চটপটে, আর দু'জন, আর দু'জন "

"কী?"

"আর দু'জন সম্পর্কে কী বলবো? এমনই সাধারণ চেহারা যেমন হয়। মুখ দেখতে পাইনি, বলবার মতন বিশেষ কিছু নেই।"

"বয়েস কত হবে?"

"তাও বলতে পারছি না। কেউ বুড়ো নয়, কেউ খুব বাচ্চাও

নয়, এইটুকু বলতে পারি।"

"কারুর গলার আওয়াজে কোনোরকম আলাদা কিছু?"

বিমান একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। ওদের মধ্যে একজনের গলার আওয়াজ তার একটু চেনা-চেনা মনে হয়েছিল। রাস্তায় যে-লোকটা বলেছিল "কী, হচ্ছে কী?"—অনেকটা সেইরকম। কিন্তু সেই লোকটাকেও তো বিমান দেখেনি। ইস্ কেন যে দেখেনি তখন! অবশ্য সেই লোকটা নাও হতে পারে।

বিমান বললো, 'গলার আওয়াজ একজনের বেশ গম্ভীর ধরনের। আর অন্যদের খুব সাধারণ যেরকম হয়।"

"ওদের গলার আওয়াজ শুনলে আবার চিনতে পারবি?"

"তা পারবো বোধহয়।"

"গুড। তোকে আমাদের কাজে লাগতে পারে। তুই প্রত্যক্ষদর্শী ছিলি কিনা! ব্যাটারা ধরা পড়বেই। যে-রকম ফাঁদ পাতা হয়েছে।"

"কী রকম ফাঁদ?"

"সে কথা আগে থেকে বলা যায় না। যাই হোক, তুই একটা কাজ করতে পারবি?"

"বলো।"

"নিউ আলিপুরে ক্রেডিট ব্যাঙ্কের যে শাখাটা আছে, তুই সেটা চিনিস? চিনিস না? আমি ঠিকানা বলে দিচ্ছি, ম্যাপ এঁকে জায়গাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, তুই কাল সেখানে সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে যাবি। কাউন্টারে গিয়ে বলবি, তুই একটা নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে চাস। ওরা যা কাগজপত্র দেবে, নিয়ে আসবি। শুধু একটু নজর রাখবি, কোনো লোকের চেহারা, চোখ বা গলার আওয়াজ শুনে তোর চেনা মনে হয় কিনা। যদি সেরকম দেখতেও পাস, তবু ওখানে কোনো কথা বলবি না। মনে থাকে যেন, ওখানে যাই ঘটুক না কেন, একটুও

চমকে উঠলে চলবে না। একদম মুখ বুঁজে থাকবি। হয়তো ওখানে কিছুই হবে না। কী, পাকা?"

"হ্যাঁ। আমি ঠিক সময় যাবো। কিন্তু তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে। যদি তুমি এই ডাকাত দলের সন্ধান পাও— কিংবা এদের খোঁজে তোমাকে বাইরে যেতে হয়, তাহলে আমাকেও সঙ্গে নেবে।"

"সে দেখা যাবে।"

॥ তিন ॥

পরদিন নিউ আলিপুরে ক্রেডিট ব্যাঙ্ক খুঁজে পেতে বিমানের কোনো অসুবিধে হলো না। ব্যাঙ্কটার কাছাকাছি এসেই তার বেশ উত্তেজনা হতে লাগলো। এখানেও আজ একটা কিছু কাণ্ড হবে নাকি?

ব্যাঙ্কে ভিড় খুব কম। দরজার কাছে একজন গোঁফওয়ালা দারোয়ান বন্দুক হাতে নিয়ে টুলের ওপর বসে আছে। চোখে একটা ঝিমুনির ভাব। নিশ্চয়ই গাঁজা খায়। এই লোকগুলো ঠিকমতন পাহারা দেন না বলেই তো ডাকাতরা সুবিধে পায়।

কাউন্টারের কাছে দু-চারজন লোক দাঁড়িয়ে। কারুকেই সন্দেহজনক মনে হলো না। লোডশেডিং, তাই পাখা বন্ধ। ভেতরের লোকেরা জামার বোতাম খুলে খবরের কাগজ দিয়ে হাওয়া খাচ্ছে।

প্রিয়ব্রত যে-রকম শিখিয়ে দিয়েছিল, সেই অনুযায়ী বিমান একটা কাউন্টারে গিয়ে নতুন অ্যাকাউণ্ট খোলার ফর্ম চাইলো। সেখানকার লোকটি দেখিয়ে দিল অন্য কাউন্টার। সেখানকার লোকটি আবার আর-একটা কাউন্টারে যেতে বললো। সেই কাউন্টারের লোকটি

আবার চেয়ারে নেই তখন? বিমানকে অপেক্ষা করতে হলো। তাতে তার অবশ্য আপত্তি নেই। সে তো সময় কাটাতেই এসেছে।

মাঝে মাঝে দু-একজন নতুন লোক ঢুকছে। কেউ টাকা জমা দিচ্ছে, কেউ তুলতে এসেছে। অস্বাভাবিক কিছুই নেই। একটা কালো চশমা-পরা লোককে দেখে একটু সন্দেহ হয়েছিল। লোড-শেডিং-এর জন্য ভেতরটা বেশ অন্ধকার অন্ধকার মতন, তবু লোকটা কালো চশমা খুলছে না কেন? কিন্তু লোকটা বড্ড রোগা, এত রোগা লোক কি ডাকাত হতে পারে? তা ছাড়া লোকটা খক্‌খক্ করে কাসছে। কেসো রুগীর পক্ষে চোর-ডাকাত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তবু লোকটা ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত বিমান তাকে লক্ষ্য করে গেল।

একটু পরেই বিমান তার কাগজপত্র পেল, কোথায় সই করতে হবে, তাও দেখে নিল। এরপর আর তার অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না। তাহলে লোকেরা তাকেই সন্দেহ করবে। 'কাল টাকা জমা দিয়ে যাবো' বলে সে আস্তে আস্তে এগোলো দরজার দিকে।

দারোয়ানটি টুলে বসে এখন সত্যিই ঢুলছে। পা দুটো ছড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে। বিমান সেখান থেকে যাবার সময় লোকটা আরও পা ছড়িয়ে দিল। ধাক্কা লেগে বিমান আর-একটু হলে উল্টে পড়ে যাচ্ছিল। বিরক্ত হয়ে তাকাতেই লোকটা মুচকি হাসলো।

সেই হাসি দেখেই চিনতে পারলো বিমান। এ তো প্রিয়ব্রতদা! দারুণ ছদ্মবেশ ধরেছে তো। একেবারে অবিকল বিহারী দারোয়ানের মতন।

এই সময় কথা বলা উচিত কি উচিত না, বুঝতে না পেরে বিমান সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে পকেটে হাত দিয়ে খুচরো পয়সা গুনতে লাগলো। প্রিয়ব্রতদা বিড়বিড় করে হিন্দীতে কী যেন বলছে, বিমান বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ বিমান 'আঁঃ!' শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠলো। তার শরীরটা থরথর করে কাঁপতে লাগলো। কয়েকজন লোক অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে। বিমান দরজার আর-এক দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। সেখানে বন্দুক ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে আছে আর-একজন দারোয়ান। একটু আগেও বিমান তাকে দেখেনি। সেই দারোয়ানটি আর কেউ নয়, বুধ সিং। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার মাথা থেকে, তবু সে বন্দুকটা চেপে ধরে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, যেন খুঁজছে ডাকাতদের।

প্রিয়ব্রতদা বিমানের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, "কেয়া হুয়া বাবুজী?"

বিমান কথা বলতে পারছে না। আস্তে আস্তে বুধ সিং-এর শরীরটা ধোঁয়ার মতন মিলিয়ে যেতে লাগলো। দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগলো বিমানের গা থেকে।

প্রিয়ব্রতদা বিমানের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলতে লাগলো, "বাবুজী, আপকা তবিয়ত আচ্ছা নেহি?"

বিমান আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নিল। কিন্তু এখনো বুকের ভেতরটা কাঁপছে। তবু প্রিয়ব্রতার দিকে তাকিয়ে বললো, "কুছ নেহি হুয়া, ঠিক হো গিয়া!"

আর দেরি না করে বিমান বেরিয়ে এলো রাস্তায়। একবার পেছন ফিরে দেখলো, প্রিয়ব্রতদা তখনো তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে হাতের ইশারা করে জানিয়ে দিল সব ঠিক আছে।

আস্তে আস্তে বিমান হাঁটতে লাগলো বাস-রাস্তার দিকে। পা দুটো খুব দুর্বল লাগছে। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে এখনো। এই অবস্থায় কি ভিড়ের বাসে ওঠা যাবে?

বিমান একটা রিক্সা নিল। কিন্তু তাতেও বেশী দূর যাওয়া গেল না। রাস্তাটায় নতুন খোয়া ফেলেছে, এখনো পিচ ঢালাই হয়নি। রিক্সাটা অনবরত লাফাচ্ছে। রিক্সাওয়ালারও কষ্ট হচ্ছে খুব।

খানিকটা গিয়েই একটা পার্ক দেখতে পেয়ে সেখানে নেমে পড়লো।

পার্কের একটা খালি বেঞ্চে বিমান বসে রইলো অনেকক্ষণ। পুরো ঘটনাটা সে আবার চিন্তা করতে লাগলো। সত্যিই কি সে ভূত দেখেছে। ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি? তবে সে প্রায়ই বুধ সিংকে দেখতে পাচ্ছে কেন! আজ একেবারে দিনের বেলায়, এত কাছ থেকে—সে স্পষ্ট দেখেছে। কিন্তু আর তো কেউ দেখেনি। সে একাই শুধু ভূত দেখছে কেন? যদিও বুধ সিং তার কোনো ক্ষতি করেনি, কিন্তু একটা মরা মানুষের গলার আওয়াজ শোনা কিংবা তাকে চোখের সামনে দেখা কি চাট্টিখানি কথা! ভয় পেতে না চাইলেও ভয় হয়!

কিংবা এটা কি চোখের ভুল? সে বারবার ভুল দেখছে? আগে তো কক্ষনো এরকম হয়নি! এবার পুরো ব্যাপারটাই মাথা থেকে মুছে ফেলতে হবে। ডাকাতদের ধরা তো পুলিশের কাজ। সে কেন মাথা ঘামাতে যাবে!

বিমান এই কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা ব্যাপার ঘটলো। সকালবেলা খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে মাঠটা কাদা হয়ে আছে। সেই জল-কাদার মধ্যে কয়েকটা ছেলে ফুটবল খেলছিল অনেকক্ষণ ধরেই। এই সময় একটা ট্যাক্সি এসে থামলো। তার থেকে প্যান্ট-শার্ট পরা একজন জোয়ান-চেহারার লোক নেমে দাঁড়াতেই সামনের কাদায় থপাস্ করে এসে পড়লো ফুট-বলটা। আর সেই কাদা ছিটকে লোকটার জামায় আর চোখে-মুখে লেগে গেল।

দৃশ্যটা দেখে বিমান হেসেই ফেলছিল। লোকটার মুখের চেহারা এমন বিচ্ছিরি হয়ে গেছে যে, না হেসে পারা যায় না!

লোকটা দারুণ রেগে গেছে। পার্কের ছেলেদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললো, "এই, কী হচ্ছে কী? বদমাস ছেলে..."

সেই চিৎকার শুনে বিমান শিউরে উঠলো। এই গলার আওয়াজ

তার খুব চেনা। তাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় ঠিক এই কথা বলেই একটি লোক চেঁচিয়ে উঠেছিল। ব্যাঙ্কের ডাকাতদের মধ্যেও একজনের গলা ঠিক এইরকমই ছিল না?

বিমান ভালো করে তাকিয়ে দেখলো, ডাকাতদের একজনের চেহারাও ঠিক এই ধরনেরই ছিল, তার খুব মনে হচ্ছে এই লোকটাই। গলার আওয়াজ অবিকল এক। লোকটার মাথার চুলগুলো থাক থাক করা। বিমান আর দেরী করলো না, তক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে পার্কের রেলিং পার হয়ে সে লোকটার হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো, "চোর, চোর, চোর!"

লোকটা প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপরই চেঁচিয়ে উঠলো, "কী, হচ্ছে কী?"

এই কথাটা বোধহয় লোকটা মুদ্রাদোষের মতন যখন-তখন বলে। সে তার হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেও বিমান সেটা শক্ত করে ধরে আছে।

পার্কের ছেলেগুলো ফুটবলটা ফেরত নেবার জন্যে রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। তারা যেন লোকটাকে ভ্যাঙাবার জন্য বলতে লাগলো, "কী, হচ্ছে কী? কী, হচ্ছে কী?"

বিমান তাদের বললো, "এ একটা ডাকাত। পুলিশ ডাকো শিগগির পুলিশ ডাকো।"

কয়েকটা ছেলে টপাটপ করে রেলিং ডিঙিয়ে এসে ঘিরে ধরলো লোকটাকে।

লোকটা এতক্ষণে ভয় পেয়েছে মনে হলো। বিমান ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করলো। পারলো না। তখন বিমানের মুখে একটা ঘুঁষি কষালো। সেই ঘুঁষিটা খেয়েই বিমান বুঝতে পারলো এরকম আর দুটো তিনটে খেলেই সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। বিমান লোকটার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের মুখ আড়াল করলো। লোকটা সেই সুযোগে পালাবার চেষ্টা করতেই বিমান কাত হয়ে তার পায়ে

মারলো ল্যাং। লোকটা ধড়াম করে পড়ে গেল কাদার মধ্যে।

লোকটাকে ওঠবার কোন সুযোগ না দিয়ে পার্কের দুটো ছেলে তার পিঠে ওপর উঠে লাফাতে লাগলো! আর গানের সুরে চাঁচাতে লাগলো, "কী হচ্ছে কী? কী, হচ্ছে কী?"

ট্যাক্সি ড্রাইভারটি তখনো দাঁড়িয়ে ছিল। সে অবাক হয়ে সব ব্যাপারটা দেখছে। বিমান খুব উত্তেজিত ভাবে বললো, "শিগগির, শিগগির একটা পুলিশ ডাকতে হবে। আপ দেখিয়ে না!"

শিখ ড্রাইভারটি গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইলো। যেন মন ঠিক করতে পারছে না। তারপর গোঁফে তা দিয়ে বললো, "পুলিশ হামারা দোস্ত হ্যায় ক্যা?"

সেই লোকটা একটা কাদা-মাখা শুয়োরের মতন জোরজার করে উঠে পড়লো! এলোপাথারি ঘুঁষি চালাতে লাগলো এদিকে সেদিকে। ছেলের দল তাতেও ভয় না-পেয়ে লোকটাকে ঘিরে রইলো। লোকটা তখন পকেট থেকে একটা ছুরি বার করলো।

এতক্ষণ যাও বা সন্দেহ ছিল, এবার সব ঘুচে গেল। লোকটা তাহলে সত্যিই ডাকাত। ছুরি দেখেই ছেলের দল ভয় পেয়ে সরে গেল, বিমানও দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল ট্যাক্সির আড়ালে। লোকটা ট্যাক্সিওয়ালার দিকে ছুরিটা ঘুরিয়ে বললো, "যানা হ্যায় কি নেহি?"

বিমান খুব আশা করেছিল, ট্যাক্সিওয়ালা বিরাট জোয়ান, সে নিশ্চয় লোকটাকে কাবু করে ফেলবে। পাঞ্জাবীরা কী একটা সামান্য ছুরি দেখে ভয় পায়?

কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালা লোকটার কথা শুনে নির্বিকারভাবে বললো "ছোরি কা কেয়া বাত হ্যায়? যানা হ্যায় তো চলিয়ে!"

ডাকাতটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসতেই সেটা হুশ্ করে বেরিয়ে গেল। ছেলেরা কিছুটা রাস্তা সেটার পেছন পেছন দৌড়ে "চোর, চোর, ডাকাত, ডাকাত" বলে চ্যাঁচালেও কোনো লাভ হলো না। রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা ছিল। আশেপাশের বাড়ির দু'একজন লোক বারান্দায়

এসে দাঁড়ালেও কেউ সাহায্য করতে এলো না। ট্যাক্সিটা চোখের আড়ালে চলে গেল।

দারুণ আফশোস হলো বিমানের। ডাকাতটাকে হাতের মধ্যে পেয়েও ধরে রাখা গেল না। এত বড় কলকাতা শহরে একজন অচেনা লোককে দু'বার দেখতে পাওয়াই আশ্চর্যের ব্যাপার। আর কি কখনো ওর দেখা পাওয়া যাবে? লোকটার মুখ অবশ্য বিমান খুব ভালো করেই দেখে রেখেছে, আর কখনো ভুলবে না, কিন্তু তাতে লাভ কী? লোকটাও নিশ্চয় এবার থেকে সাবধান হয়ে যাবে। পকেটে সব সময় ছুরি নিয়ে ঘোরে, তার মানে সাঙ্ঘাতিক লোক।

একবার বিমান ভাবলো, এক্ষুনি ব্যাঙ্কে ফিরে গিয়ে প্রিয়ব্রতদাকে সব কথা বলে। কিন্তু প্রিয়ব্রতদা যদি সব শুনে বকুনি দিতে শুরু করে? চোখের সামনে দিয়ে ডাকাতটা পালিয়ে গেল!

পার্কের ছেলেগুলো বিমানকে ঘিরে ধরে এক সঙ্গে সবাই মিলে কথা বলছে। বিমান কোনোরকমে তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লো।

॥ চার ॥

পরের দিন সকালেই প্রিয়ব্রত এসে হাজির। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তুই কাল ওরকম করছিলি কেন? তোর শরীর খারাপ লাগছিল?"

বিমান আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল যে, ভূতের ব্যাপারটা কারুকে বলবে না। দিন-দুপুরে কেউ কখনো ভূত দেখে। প্রিয়দা নিশ্চয়ই হাসবে। তাহলে ওটা চোখের ভুলই হবে। বুধ সিং একেবারে বিমানের কোলের ওপর মাথা রেখেই মরে গিয়েছিল কিনা, সেইজন্যই ওকে ভোলা যাচ্ছে না।

বিমান বললো, "নাঃ, কিছু হয়নি, তোমাকে ঐ রকম পোশাকে দেখে চমকে গিয়েছিলাম।"

প্রিয়ব্রত বললো, "তুই এমন একটা ভাব করলি, যেন অজ্ঞান হয়ে পড়েই যাবি। যাক্ গে, তুই ব্যাঙ্কে সন্দেহজনক কারুকে দেখলি?"

"না। শোন না, তারপরে কী হলো।"

"কী হয়েছে?"

"একটা ডাকাতকে একেবারে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিলাম।"

"কী?"

বিমান তখন পার্কের পাশের ঘটনাটা সব বললো। শুনতে শুনতেই প্রিয়ব্রতর মুখটা গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল, শেষ হবার পর সে ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লো। হতাশভাবে বললো, "যাঃ, তুই এরকম একটা কেলেংকারি করলি?"

বিমান বললো, "কী করবো! লোকটা ছুরি বার করলো যে। নইলে আমরা সবাই মিলে লোকটাকে ধরে রাখতে পারতাম!"

"ঐ রকমভাবে ডাকাত ধরে! এখনো ছেলেমানুষ রয়ে গেলি!"

"তাহলে কী করে ধরতাম বলো?"

"লোকটাকে ধরাই উচিত হয়নি!"

"ধরা উচিত হয়নি? এমনি-এমনি ছেড়ে দেবো?"

"নিশ্চয়ই! আরে বুদ্ধুরাম, ঐ রকম ভাবে কেউ ডাকাত ধরে? তুই সব নষ্ট করে দিলি!"

"তাহলে আমার কি করা উচিত বলো?"

"তোর উচিত ছিল লোকটাকে কিছু না বলে পেছন পেছন যাওয়া। লোকটা যখন ট্যাক্সি থেকে নামল, তখন নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনো বাড়িতে যেত। তোর উচিত ছিল সেই বাড়িটা দেখে আসা। একবার ওদের আস্তানাটা চিনতে পারলে দলসুদ্ধ সবাইকে ধরা যেত।"

বিমান একটু থতমত খেয়ে গেল। এ কথাটা তো ঠিক। অনেক বইতেই পড়েছে যে ডিটেকটিভরা অনেক সময় চোর-ডাকাতদের

নুসরণ করে, প্রথমেই ধরে না। অত বড় লম্বা-চওড়া লোকটাকে রার চেয়ে অনুসরণ করাইতো সুবিধের ছিল অনেক।

প্রিয়ব্রত বললো, "এরপর এ পাড়ায় আর লোকটা আসবেই না। খানে যদি ওদের কোন আস্তানা থেকে থাকতো, সেটাও নিশ্চয়ই তুলে দিয়েছে।"

বিমান চুপ করে বসে রইলো।

প্রিয়ব্রত বললো, "যাক গে, যা হবার হয়ে গেছে। চল, আমার ঙ্গে দমদমে যাবি?"

"দমদমে, কেন?"

"ঘুঘুডাঙ্গা রেল স্টেশন থেকে মাইল দেড়েক দূরে একটা ডেড ডি পাওয়া গেছে।"

বিমান লাফিয়ে উঠলো। উত্তেজিতভাবে বললো, "চলো, এক্ষুনি লো!"

ঝটপট প্যান্ট-শার্ট বদলে নিল বিমান। শু পড়লো। তারপর যই বেরুতে যাবে, সেই সময় বাবা ডাকলেন।

বিমানকে বাইরে যাবার পোষাকে তৈরি দেখে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাচ্ছিস এখন?"

বিমান বেশ ভারিক্কীভাবে বললো, "প্রিয়দার সঙ্গে দমদমে যাচ্ছি!"

বাবা প্রিয়ব্রতর দিকে অবাকভাবে তাকিয়ে বললেন, "সে-ব্যাপারে বিমান কী করবে? না, না, ওসব খুনে-ডাকাতদের ব্যাপারে বিমানের যাবার দরকার নেই।"

বাবা কোনো ব্যাপারে একবার 'না' বললে আর 'হ্যাঁ' করানো খুব শক্ত। বিমান একটু দমে গেল। এরকম একটা দারুণ কাণ্ড থেকে সে বাদ পড়ে যাবে!

প্রিয়ব্রত বললো, "চলুক না, আমার সঙ্গেই তো যাচ্ছে, কোনো ভয় নেই।"

বাবা বললেন, "তুমি পুলিশে কাজ করো, তুমি তো যাবেই। কিন্তু ও কেন পড়াশুনো ফেলে ছোটাছুটি করতে যাবে?"

"ওকে দরকার আমাদের। ও হয়তো লোকগুলোকে চিনতে পারবে।"

"ও কী করে চিনবে? লোকগুলোর মুখ ঢাকা ছিল। পুলিশের সঙ্গে বেশী ঘোরাঘুরি করলে ডাকাতরা যদি ওকেই চিনে ফেলে?"

"ঠিক আছে, আর কখনো যাবে না, আজকে শুধু যাক—আমি ডেপুটি কমিশনারকে বলে এসেছি যে, ওকে নিয়ে যাবো।"

অনেক ঝুলোঝুলি করে প্রিয়ব্রত দা বাবাকে রাজী করালো। বাবা তবুও গজগজ করতে লাগলেন।

নীচে জীপ গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। প্রিয়ব্রত অন্যদিন এমনিই বাসে চেপে আসে কিংবা ট্যাক্সিতে। বিমানের একটু গর্ব-গর্ব ভাব হলো। আজ পুলিশের জিপ এসেছে তাকে নিয়ে যাবার জন্য।

গাড়ীতে যেতে যেতে প্রিয়ব্রত বললো, "তোর তো ডেড বডি দেখার অভ্যেস নেই, ভয়-টয় পাবি না তো?"

"না, ভয় পাবো কেন?"

"আমরা তিনটে ব্যাঙ্কে ফাঁদ পেতে রেখেছি, ব্যাটারা পা দেবেই ঠিক।"

"তুমি রোজ দারোয়ান সেজে বসে থাকো!"

"হ্যাঁ।"

বিমান হেসে ফেললো। প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করলো, "হাসছিস যে?"

"গোঁফ লাগিয়ে তোমায় যা মজার দেখাচ্ছিল!"

প্রিয়ব্রত বললো, "একবার একদল ডাকাতকে ধরবার জন্য আমি এক মাস খবরের কাগজের হকার সেজেছিলাম। রোজ ভোরবেলা সাইকেলে চেপে একটা গলির সব বাড়ীতে কাগজ দিতাম।"

"তারপর কী হলো?"

"একটা বিশেষ বাড়ির ওপর নজর রাখতাম। দেখতাম, ভোরবেলা কারা কারা সেই বাড়িতে আসে। সাধারণত ক্রিমিনালদের মিটিং ভোরের দিকেই হয়। সেবার এক ঝাঁকে এগারো জনকে ধরেছিলাম।

গাড়ি এসে গেছে দমদমে। গাড়িটা থেকে নেমে রেল লাইনের কাছে আসবার পর দেখা গেল দূরে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে আছে। আরও কয়েকজন পুলিশকেও দেখা যাচ্ছে। প্রিয়ব্রত বললো, "যতদূর মনে হচ্ছে, আমাদের ডাকাতদের কেউ নয়। রেল-লাইনের পাশে সাধারণত স্মাগলারদের ডেড বডিই পাওয়া যায়।"

প্রিয়ব্রতর অফিসের ডেপুটি কমিশনারও এসে গিয়েছিলেন। খুব লম্বা-মতন একজন লোক, একদম পুলিশের মতন দেখতে নয়, হাসি-হাসি মুখ। কোমরে রিভলবার-টিভলবার কিছু নেই। প্রিয়ব্রত ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে বিমানের আলাপ করিয়ে দিলেন।

তিনি বললেন, "চলো, একবার দেখা যাক।"

ভিড় ঠেলে ওরা এগোলো। প্রিয়ব্রত দেখলো দুটো পুলিশ-কুকুরও এসে গেছে। তাদের গলার চেন শক্ত করে ধরে আছে একজন, কুকুরও দুটো জিভ বার করে হা-হা করছে।

মৃতদেহটা রেল লাইনের পাশে গড়ানো জায়গাটায় পড়ে আছে কাত হয়ে। মনে হয়, কেউ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে।

প্রিয়ব্রত পকেট থেকে একটা কালো কাপড় বার করে বিমানকে বললো, "আমি ওর মুখের খানিকটা ঢেকে দিচ্ছি, তারপর ছাখ চিনতে পারিস কিনা?"

বিমান বললো, "দাঁড়াও!"

বিমানের চোখ দুটো গোল হয়ে গেছে। গলা দিয়ে ঠিক আওয়াজ বেরুচ্ছে না। কোনোক্রমে বললো, "এ তো, এ তো সেই—"

প্রিয়ব্রত ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "চিনতে পেরেছিস?"

বিমান বললো, "এ তো সেই কালকের ট্যাক্সি ড্রাইভার।"

প্রিয়ব্রত অবিশ্বাসের সঙ্গে বললো, "কী? ঠিক বলছিস?"

"হ্যাঁ। কোনো ভুল নেই।"

ডেপুটি কমিশনার জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ট্যাক্সি ড্রাইভার?"

প্রিয়ব্রত খুব সংক্ষেপে তাঁকে কালকের ঘটনাটা শোনালো।

ডেপুটি কমিশনার শিস দিয়ে উঠলেন। তখনো হাসি-হাসি মুখেই বললেন, "তা হলে তো এরা সাধারণ ডাকাতের চেয়েও অনেক সাঙ্ঘাতিক ক্রিমিনাল। প্রিয়ব্রত, এই ছেলেটিকেও কিন্তু এবার থেকে সাবধানে রাখতে হবে।"

॥ পাঁচ ॥

আরও চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট সেখানে থাকার পর ওরা ফিরে এলো গাড়ীর কাছে। ডেপুটি কমিশনার বললেন, "প্রিয়ব্রত তুমি আর বিমান আমার গাড়িতেই এসো। আমি তোমাদের নামিয়ে দিচ্ছি।"

ডেপুটি কমিশনারের গাড়িটা জিপ নয়, অ্যামবাসাডর। তারই ভেতরে ওয়ারলেস ফিট করা। কারা যেন মাঝে মাঝে ইংরেজী সিনেমার লোকদের মতন জড়ানো ইংরেজীতে কী সব বলে, গাড়ির কেউ তা মন দিয়ে শোনেও না, উত্তরও দেয় না। ড্রাইভারের পাশে আর একজন লোক সব সময় চুপ করে বসে থাকে।

গাড়ি খানিকটা দূর চলার পর ডেপুটি কমিশনার বললেন, "শুধু শুধু একটা ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ওরা খুন করলো কেন?"

প্রিয়ব্রত বললো, "স্যার, লোকটির দেহে কিন্তু কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না।"

"লোকটার জিভটা বেরিয়ে এসেছে অনেকখানি। মনে হলো খুব ভয় পেয়েছিল।"

"অত বড় চেহারার একজন শিখ ড্রাইভার কিসে ভয় পাবে? গলা টেপার কেস হতে পারে।"

"কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ড্রাইভারটাকে মারলো কেন?"

প্রিয়ব্রত বললো, "নিশ্চয় ওরা ট্যাক্সিটা চুরি করে পালিয়েছে।"

"তা তো হতেই পারে। সেটা একটা সোজা উত্তর। কিন্তু ডাকাতি করার সময় ওরা ট্যাক্সিতে আসেনি, কালো রঙের গাড়িতে এসেছিল—অন্য ডাকাতি-গুলোতেও ওরা গাড়ি এনেছে। তার মানে ওদের গাড়ি আছে।"

"সেগুলোও চোরাই গাড়ি হতে পারে।"

"তা তো হতেই পারে। কলকাতা শহরে রোজ তের-চৌদ্দখানা গাড়ি চুরি হয়।"

বিমান জিজ্ঞেস করলো, "ডাকাতরা সব সময় কালো রঙের গাড়ি চেপেই আসে কেন?"

প্রিয়ব্রত বললো, "তার কারণ চট্ করে ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে পারে। শহরে এত অসংখ্য কালো গাড়ি আছে যে, কোনো একটা কালো গাড়ি দেখে কেউ কিছু মনে রাখতে পারে না।"

ডেপুটি কমিশনার বললেন, "আচ্ছা ভাই বিমান, তুমি একটা জিনিস বলতে পারবে? কলকাতায় দু-রকম ট্যাক্সি চলে, এক রকম হচ্ছে হলদে-কালো রঙের, আর এক রকম শুধু হলদে। ঐ ট্যাক্সিটা কোন্ রঙের ছিল?"

"শুধু হলদে।"

"নম্বরটা কি দেখেছিলে?"

"নম্বর তো দেখবোই। ডাকাতটা ট্যাক্সি করে পালালো, আর আমি তার নম্বর দেখবো না?"

প্রিয়ব্রত চিৎকার করে বললো, "তা হলে এতক্ষণ বলিসনি কেন?"

"আমি ভেবেছিলাম, ডাকাতটা তো একটু বাদেই ট্যাক্সি থেকে

নেমে যাবে, তাই ঐ নম্বরটা আর কোনো কাজে লাগবে না।"

"সব কিছুই কাজে লাগে।"

ডেপুটি কমিশনার মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "মনে আছে নম্বরটা?"

"ডব্লু-বি-টি জিরো টু ফাইভ সেভেন।"

ডেপুটি কমিশনার একটু ঝুঁকে সামনের সীটে চুপ করে বসে-থাকা লোকটিকে নম্বরটা বলে দিলেন। সেই লোকটি নম্বরটা এমনভাবে বিড়বিড় করতে লাগলো, যেন সেটা মুখস্থ করছে। লোকটা নিশ্চয় গবেট, নইলে সামান্য একটা গাড়ির নম্বর অতবার ধরে মুখস্থ করতে হয় কেন?"

ডেপুটি কমিশনার প্রিয়ব্রতকে বললেন, "সকালে চা খেয়েছো? নইলে রাস্তার ধারের কোনো দোকান থেকে··"

প্রিয়ব্রত বললো, "আমরা খেয়েছি। আপনি যদি খেতে চান··"

"আমি তো সকালে পাঁচ কাপ চা খাই। চার কাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখন থাক।"

প্রিয়ব্রতকে খুব উত্তেজিত দেখালেও ডেপুটি কমিশনার আগের মতনই শান্ত। ঠোঁটে হাসি লেগে আছে। তিনি মনে মনে কিছু একটা হিসেব করে বললেন, "পর পর যে-ক'টা ডাকাতি হয়েছে, সবগুলোই যদি এই একটা দলই করে থাকে, তা হলে ওরা অন্তত আট লাখ টাকা পেয়েছে। কম টাকা নয়। এত টাকা নিয়ে লোকগুলো করবে কি?" এই বলে তিনি আপন মনে হাসতে লাগলেন।

প্রিয়ব্রত বললো, "এই ধরনের ডাকাতরা যখন-তখন খুন করে না।"

সে-কথা অগ্রাহ্য করে ডেপুটি কমিশনার আবার বললেন, "ডাকাতরা এত টাকা নিয়ে কী করে বলতে পারো? সব সময়েই তো তারা পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। ভোগ করে কখন? এই ধরো

না, সারা রাত গাড়ী চালিয়ে ওরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে মালদা পার হয়ে গেছে !"

প্রিয়ব্রত অবাক হয়ে বললো, "মালদা ? ওরা মালদায় যাবে কেন ?"

"দমদম দিয়ে যারা গাড়িতে পালায়, তারা সাধারণত বহরমপুরের দিকের হাইওয়ে ধরে। তারপর ফারাক্কা পেরিয়ে সোজা দৌড়।"

ওয়ারলেসে তখনও বক্‌বক্ করে যাচ্ছে। কথা বোঝা না-গেলেও বিমান এবার শুনতে পেল, ট্যাক্সির নাম্বারটা উচ্চারণ করছে বেশ কয়েকবার। অর্থাৎ পুলিশ থেকে নাম্বারটা চারিদিকে জানিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ডাকাতরা তো যখন-তখন গাড়ির নাম্বারটা পাল্টে ফেলে। তা হলে কী লাভ হবে ?

ডেপুটি কমিশনার বিমানের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন' "গত এক মাস ধরে ফারাক্কা ব্রীজে সব গাড়ির নাম্বার লিখে রাখা হচ্ছে।" তারপরই তিনি ড্রাইভারকে বললেন, "গাড়ি থামাও !"

ড্রাইভার খ্যাঁচ করে ব্রেক কষে রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করালেন। প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করলেন, "স্যার, আপনি কি এখানে চা খাবেন ?"

তিনি বললেন, "না।"

তারপর চুপ করে বসে রইলেন। যেন ধ্যান করছেন। প্রিয়ব্রত আর বিমান দুজনেই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

একটু বাদে পেছন থেকে একটা জিপ খুব জোরে ছুটে এসে গাড়িটার পাশে থামলো। সেটা থেকে একজন পুলিশ অফিসার নেমে ঠকাস করে জুতোয় শব্দ করে স্যালুট করতেই ডেপুটি কমিশনার ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় ?'

"স্যার, ময়নাগুড়ির কাছে।"

তিনি প্রিয়ব্রতর দিকে ফিরে বললেন, "বলেছিলাম না ! উত্তর-বঙ্গটাই পালাবার পক্ষে সবচেয়ে ভাল জায়গা !"

প্রিয়ব্রত উর্দ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো, "কী হয়েছে, স্যার? ময়নাগুড়িতে কী হয়েছে?"

বাইরে পুলিশটি বললো, "ময়নাগুড়ি থেকে তিন মাইল দূরে রাস্তার ধারে ঐ ট্যাক্সিটা উল্টে পড়ে আছে। ভেতরে একটা ডেড বডি।"

ডেপুটি কমিশনার আবার শিস দিয়ে উঠলেন। তারপর প্রিয়ব্রতর দিকে চোখ নাবিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী?"

"আমাদের এক্ষুনি যাওয়া উচিত।"

"যাও!"

"আমি তাহলে ঐ জিপটা নিচ্ছি। আপনি আমার বাড়িতে একটা খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।"

"তা করবো। একা যাবে, না স্কোয়াডের আর দু-একজনকে সঙ্গে নেবে?"

"আমি এগিয়ে পড়ি। দরকার হলে চক্রবর্তী আর মিত্তির পরে আসবে।"

"ঠিক আছে' পরে আমি ওদের প্লেনে শিলিগুড়ি পাঠিয়ে দেবো। এই ছেলেটিকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।"

প্রিয়ব্রত গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। সে দরজা বন্ধ করার আগেই বিমান বললো, "আমিও যাবো!"

প্রিয়ব্রত বললো, "তুই কোথায় যাবি? পাগল নাকি? মেশোমশাই দারুন রেগে যাবেন।"

"কিছু হবে না। আমি যাবোই।"

"স্যার আপনি ওকে বারণ করুন।"

ডেপুটি কমিশনার মুচকি হেসে বললেন, "যাক না। ও গেলে আইডেন্টিফিকেশনের সুবিধা হবে!"

আর কথা না বাড়িয়ে বিমান তাড়াতাড়ি গিয়ে জিপটায় উঠে পড়লো। প্রিয়ব্রত গোমড়া মুখে তার পাশে এসে বসলো, "তোকে

নিয়ে এখন ঝঞ্ঝাটে পড়লাম ! যদি তোর কোনো বিপদ-টিপদ হয় ! আমাদের ডি-সিও এমন পাগল !"

গাড়ী ছুটলো কৃষ্ণনগরের দিকে। অন্য পুলিশ অফিসারটি দমদমের কাছে নেমে গেছে। গাড়িতে এখন ড্রাইভার ছাড়া শুধু প্রিয়ব্রত আর বিমান।

বিমান জিজ্ঞেস করলো, "প্রিয়দা, তোমার কাছে রিভলবার আছে ?"

"কেন ?"

"ডাকাত ধরতে যাচ্ছো, রিভলবার লাগবে না ?"

প্রিয়ব্রত জামাটা উঁচু করে দেখালো। বিমান বললো। "আমাকে একটু দাও তো। আমি কখনো রিভলবার ছুঁয়ে দেখিনি।"

সেটা হাতে নিয়ে বিমান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। জিনিসটা খুব ঠাণ্ডা। এটার ভেতর থেকে আগুনে গরম বুলেট বেরুতে পারে, ভাবাই যায় না।

"আমি একবার চালাবো।"

"তারপর তুই অ্যাকসিডেণ্ট করে মর, আর আমি খুনের দায়ে ধরা পড়ি !"

"অ্যাকসিডেণ্ট হবে কেন ? তুমি শিখিয়ে দাও।"

"একটা বুলেটের দাম কত জানিস ?"

"কে এখানে হিসেব নিচ্ছে ? অত কিপ্টেমি করছো কেন ? আমি শিখে রাখলে পরে কাজে লাগতে পারে।"

রাস্তার দু'ধারে ফাঁকা মাঠ। ধারে-কাছে মানুষজন নেই। গাড়িটা থামিয়ে প্রিয়ব্রত বিমানের রিভলবার শুদ্ধ ডান হাতটা চেপে ধরলো। তারপর বললো, "মাত্র একবার কিন্তু। দূরে ঐ গাছটার দিকে টিপ কর। মনে রাখবি, হাতটা যেন পেছন দিকে চলে না আসে। সেই সেফটি ক্যাচ্। এটাকে রিলিজ করে তারপর..."

হু-ই-স শব্দে বুলেট বেরিয়ে গেল। বিমানের হাতের জোরে

একটা ঝাঁকুনি লাগলো শুধু গুলিটা দূরের গাছটায় লাগলো কিনা তা বোঝা গেল না।

প্রিয়ব্রত বললো। "থাক, যথেষ্ট হয়েছে।"

তার পর ঘড়ি দেখে বললো, "শিলিগুড়ি পৌঁছাতে আমাদের অন্তত রাত নটা বেজে যাবে। ওদের ট্যাক্সিটা অত তাড়াতাড়ি ময়নাগুড়ি পৌঁছালো কী করে, সেটাই আশ্চর্য।"

ওরা মালদায় একটা হোটেলে ভাত খেয়ে নিল। তারপর আবার জিপ ছুটলো। শিলিগুড়ি পৌঁছে গেল নটার অনেক আগেই। তারপর ময়নাগুড়ি আর খুব বেশী দূর নয়। প্রিয়ব্রত প্রথমেই চলে এলো থানায়। সেখানকার ও-সিকে নিয়ে এলো স্পটে।

ট্যাক্সিটা রাস্তা থেকে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ে কাত হয়ে আছে। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। জোরালো টর্চের আলোয় হলদে ট্যাক্সিটা চক্‌চক্ করছে। প্রিয়ব্রত সেটার কাছে গিয়ে দরজা খুলে উঁকি দিল। তারপর চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "ডেড বডি কোথায় রেখেছেন ?"

ও-সি বললেন, "আপাতত থানাতেই রাখা আছে।"

"গাড়িটা এখানে কখন দেখা গেছে ?"

"সকাল থেকেই তো, মনে হয় কাল রাত্তিতেই "

"তা হতেই পারে না। শুনুন, ট্যাক্সিটা কাল রাত্তিরে কলকাতা থেকে ছেড়েছে। যত জোরেই আসুক, আজ সকাল ছটা-সাতটার আগে এখানে পৌঁছানো অসম্ভব। সুতরাং অ্যাকসিডেন্টটা হয়েছে দিনের আলোয়। তখন এ-পথ দিয়ে অনেক গাড়ি যায়। অ্যাকসিডেন্টটা কেউ না কেউ দেখে থাকতে পারে। ট্যাক্সির অন্য লোকেরা নিশ্চয়ই অন্য কোনো গাড়িতে গেছে। সে সম্পর্কে কিছু খোঁজ নিয়েছেন ?"

"কিছু তো খবর পাইনি !"

প্রিয়ব্রত বিরক্তভাবে বললো, "খবর কি আর আপনা-আপনি

আসে? চলুন, ডেড বডিটা দেখে আসা যাক্!"

থানার পেছন দিকের বারান্দায় একটা কম্বল মুড়ে মৃতদেহটি রাখা হয়েছে। বিমানের গা ছমছম করতে লাগলো। এবার সে কাকে দেখবে? পার্কের কাছে যে-লোকটাকে দেখেছিল?

প্রিয়ব্রত হাঁটু মুড়ে বসে নিজেই মৃতদেহের মুখ থেকে কম্বলটা সরিয়ে দিল। তারপর সে নিজেই একটা ভয়ের শব্দ করে উঠলো।

মৃতের মুখখানা বীভৎস। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মৃত্যুর আগে লোকটা যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল। সম্ভবত তাকে মারা হয়েছে গলা টিপে।

"একে চিনতে পারছিস?"

বিমান নিঃশব্দে দুদিকে ঘাড় নাড়লো।

"কী?"

"আমি একে দেখিনি কখনো।"

"ভালো করে তাকিয়ে ত্মাখ।"

প্রিয়ব্রত পকেট থেকে কালো রুমালটা বার করে লোকটার মুখের খানিকটা অংশ ঢেকে দিল। তাতে লোকটার শুধু চোখ দুটো বেশী করে দেখা গেল। বিমান মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললো, "উঃ, আমি আর তাকাতে পারছি না। প্রিয়দা, আমি সত্যিই চিনতে পারছি না।"

প্রিয়ব্রত একটু দমে গেল। কম্বল দিয়ে মৃতদেহটা আবার ঢেকে দিয়ে বললো, "তাহলে কি মিছিমিছি এতটা দূর এলাম?"

ও সি-র দিকে তাকিয়ে আবার বললো, "এই লোকটার পকেটে কী-কী পাওয়া গেছে, আমি একটু দেখতে চাই।"

"কিছুই পাওয়া যায়নি।"

"অ্যাঁ?"

"লোকটার পকেটে এক টুকরো কাগজ পর্যন্ত ছিল না। ওর সঙ্গের লোকেরা সব কিছুই নিয়ে গেছে। আমার ধারণা কী জানেন?

ট্যাক্সিটার ঠিক অ্যাকসিডেন্ট হয় নি। লোকটাকে আগে খুন করে তারপর কেউ ইচ্ছে করে ট্যাক্সিটা মাঠের দিকে চালিয়ে দিয়েছে।"

প্রিয়ব্রত সাবান দিয়ে হাত ধুতে ধুতে বললো, "তা আবার হয় নাকি? গাড়ি কি বাইরে থেকে চালানো যায়? গাড়ি চালাতে গেলে কারুকে ভেতরে বসতে হবে।"

"গাড়িটা ঠেলে গড়িয়ে দিতে পারে।"

"তা হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। বাকী লোকগুলো গেল কোথায়? তারা তাহলে নিশ্চয়ই অন্য-একটা গাড়ি জোগাড় করেছিল। একটু খোঁজ নিতে পারেন, এ-অঞ্চলে কারুর গাড়ি কিংবা ট্যাক্সি চুরি গেছে কিনা?"

ও সি বললেন, "আমি এক্ষুনি চারিদিকে খবর পাঠাচ্ছি।"

বেশ রাত হয়ে গেছে, এখন আর কিছু করার উপায় নেই। সারাদিন জিপে এসে প্রিয়ব্রত আর বিমান দুজনেই ক্লান্ত। খিদেও পেয়েছে।

ওদের দুজনের জন্য খাবারও তৈরি হয়ে আছে। রাত্তিরে থাকার জন্য ঘর ঠিক হয়ে আছে ডাকবাংলোয়। ডেপুটি কমিশনার দুপুরেই কলকাতা থেকে খবর পাঠিয়েছিলেন যে, ওরা আসছে।

ডাকবাংলোয় এসে ওরা খাওয়াদাওয়া সেরে নিল। ওসি-কে বলে রাখা হলো যেন কোনো রকম খবর পাওয়া গেলে তক্ষুনি প্রিয়ব্রতকে জানানো হয়। ঘরের মধ্যে পাশাপাশি দুটো খাট। ফরসা চাদর পাতা। প্রিয়ব্রত বললো, "কাল সকালেই এক সেট করে জামা-কাপড় কিনে নিতে হবে। কিছুই তো আনা হয় নি। তুই এবার শুয়ে পড় বিমান!"

বিমান বললো, "কীরকম মজা লাগছে। সকালবেলা ছিলাম কলকাতায়, রাত্তিরে শুয়ে আছি ময়নাগুড়িতে। কোনোদিন এখানে আসবার কথা ভাবি নি। আমি যদি সেদিন বাবার চেকটা ভাঙাতে না যেতাম, তাহলে সেই ডাকাতিটাও দেখতাম না, এখানেও আসা

হতো না! তারপর তুমিই আবার এই কেসটা নিয়েছ। না হলে পুলিশ কি আমাকে এতটা পাত্তা দিত। কীরকম অদ্ভুত যোগাযোগ।"

প্রিয়ব্রত গম্ভীরভাবে বললো, "তোর কথার উপর নির্ভর করে এতটা দূরে চলে এসেছি। সবটাই যদি ভুল হয়? হয়তো ট্যাক্সি-ড্রাইভার খুনের সঙ্গে ডাকাতির কোনো সম্পর্কই নেই। এটা একটা অন্য দল।"

বিমান বললো, "তোমাকে আমি একটা কথা বলতে পারি। কালকের পার্কের ধারে সেই ডাকাতটা যে এই ট্যাক্সিতে উঠেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাকে আমি দেখলে ঠিকই চিনতে পারবো।"

"তুই যেমন তাকে চিনে রেখেছিস, তেমনি সেই লোকটাও তোকে দেখলে ঠিক চিনতে পারবে।"

"তা তো পারবেই।"

"আবার দেখা হলে লোকটা তোকে মোটেই পছন্দ করবে না।"

"তাতে আমার বয়ে গেছে!"

"সেইজন্য ডেপুটী কমিশনার বলছিলেন তোকে সাবধানে থাকতে। তোকে এত দূর নিয়ে এসে ভুলই করেছি বোধহয়।"

দু জনেই এক সময় চুপ করে গেল। বাইরে কোথায় যেন খর্‌র্-খর্‌র্ শব্দে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠলো। অনেক দূরে একটা মটর গাড়ির আওয়াজ। তা ছাড়া সব চুপচাপ। প্রিয়ব্রতর বড় বড় নিশ্বাস পড়েছে, বিমানের ঘুম আসছে না।

একটু পরেই বিমান খাট থেকে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে লাগলো, "প্রিয়দা, প্রিয়দা!"

প্রিয়ব্রত ধড়মড় করে উঠে বললো, "কী হয়েছে? এই বিমান, কী হয়েছে?"

বিমান দৌড়ে এসে প্রিয়ব্রতর হাত চেপে ধরলো। সে ঠক ঠক

করে কাঁপছে। প্রিয়ব্রত তাকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, "কী হয়েছে? বল্ না!"

প্রিয়ব্রত তাড়াতাড়ি আলো জ্বাললো। বিমানের মুখখানা কাগজের মতন সাদা। কোনো কারণে সে অসম্ভব ভয় পেয়েছে। ঘরের দরজা বন্ধই আছে।

প্রিয়ব্রত আবার তাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, "কী হয়েছে? কিছু দেখেছিস!"

বিমান আস্তে আস্তে বললো, "কিছু না।"

"কিছু না মানে? স্বপ্ন দেখেছিস? তাতেই এত জোর চেঁচিয়ে উঠলি? আঃ, ছেলেমানুষ আর কাকে বলে!"

বিমান খাটের ওপর ধপ করে বসে পড়ে বললো, "স্বপ্ন নয়। নিজের চোখে দেখেছি। ঐখানটাতে, ঠিক টেবিলের পাশটায় দাঁড়িয়েছিল।"

"দরজা বন্ধ, কে আবার এখানে আসবে! যা, চোখেমুখে জল দিয়ে আয়। মাথা গরম হয়ে গেছে তোর।"

"প্রিয়দা, বিশ্বাস করো, আমি সত্যি সত্যি দেখেছি।"

"কাকে দেখেছিস, সেটা বলতে পারছিস না?"

"বুধ সিংকে।"

"সে কে?"

"বাঃ, ভুলে গেলে? সেই যে ব্যাঙ্কের দারোয়ানটা মারা গেল—আমি স্পষ্ট দেখলাম। সে এসে দাঁড়িয়েছে, হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এমন কি, একটা কী কথাও বললো, ঠিক বুঝতে পারলাম না. মনে হলো যেন সে বলছে, মা দাঁড়িয়ে—"

"মা দাঁড়িয়ে? তার মানে কি?"

"কি জানি, আমিও তো বুঝতে পারছি না।"

প্রিয়ব্রত চিন্তিত ভাবে মুখ নিচু করলো। তারপর বললো, "তোর শরীরটা খুব দুর্বল আছে, না রে?"

"না তো! আমার শরীর ঠিক আছে। তুমি ভাবছো, আমি চোখের ভুল দেখছি? কানেও ভুল শুনলাম? শোন প্রিয়দা, আমি এই বুধ সিংকে মাঝে মাঝেই দেখতে পাই। আধ মিনিট কি এক মিনিটের জন্য, তারপরই মিলিয়ে যায়—"

প্রিয়ব্রত গম্ভীরভাবে বললো, "হুঁ!"

"তুমি বিশ্বাস করছো না তো? তুমি ভূতে বিশ্বাস করো না, তাই না?"

"কোন ভদ্রলোকই করে না!"

"আমিও করতাম না। ছেলেবেলায় করতাম অবশ্য, কিন্তু বড় হয়ে আর—তবু এটা কেন হচ্ছে? সত্যি সত্যি দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় যেন লোকটা আমাকে কিছু বলতে চায়।"

"তুই ওর কথা বেশী ভাবছিস বোধহয়। তাতে অনেক সময় ওরকম হয়। লোকটা তোর কোলেই মাথা রেখে মরেছিল তো। সেইজন্য তুই ওকে ভুলতে পারছিস না। মানুষের কল্পনায় যে কত কী হতে পারে।"

"কিন্তু কল্পনায় এত স্পষ্ট দেখা যায়? যেমন তোমাকে দেখছি, সেইরকম ভাবে ওকে দেখি—মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে, ঠোঁট নেড়ে কিছু বলতে যাচ্ছে—তবে খুব অল্প সময়ের জন্য—কুড়ি সেকেণ্ড, তিরিশ সেকেণ্ড—"

"যারা আত্মায় বিশ্বাস করে, তারা বলে, অনেক সময় মৃত্যুর পরেও আত্মা শরীর ধরতে পারে—তবে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না—তবে এর কোনো প্রমাণ হয়নি এখনো। যা প্রমাণ হয়নি, তা বিশ্বাস করা যায় না। যা, ঘুমিয়ে পড়—অত চিন্তা করতে হবে না।"

কিন্তু ঘুমোতে যাওয়া হলো না। এই সময় দরজায় খট্‌খট্ শব্দ হলো। প্রিয়ব্রত চেঁচিয়ে বললো, "কে?"

"স্যার, আমি থানা থেকে আসছি।"

দরজা খুলে দেখা গেল, একজন সাব-ইন্সপেক্টর। সে বললো,

"স্যার, ও-সি আপনাকে একটা খবর দিতে বললেন। আজ দুপুরে ধূপগুড়িতে তিনজন লোক একটা জিপ ভাড়া করেছে। জিপওয়ালা প্রথমে ভাড়া দিতে রাজী হয়নি। কিন্তু তারা বলেছে, যত টাকা লাগে দেবে। লোকগুলো এখানকার স্থানীয় লোক নয়।"

প্রিয়ব্রত বললো, "হুঁ। তারা ঠিক কখন গেছে?"

"জিপটায় কয়েকটা টুকটাক সারাবার কাজ ছিল। বেরুতে বেরুতে ওদের প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেছে।"

প্রিয়ব্রত দারুণ আফসোসের সঙ্গে বললো, "ইস্! সন্ধ্যে পর্যন্ত ওরা এত কাছে ছিল, কেউ ধরতে পারেনি। ওঁরা কোন্ দিকে গেছে, তা কেউ বলতে পারছে?"

"গ্যারেজের একটা ছেলে বলছে, ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে মাদারিহাটের দিকে যাবে।"

"মাদারিহাট কোথায়?"

"বীরপাড়া হয়ে যেতে হয়।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। এত রাত্রে তো কিছু করার উপায় নেই। কাল সকালে দেখা যাবে।"

লোকটি চলে যাবার পর প্রিয়ব্রত দরজা বন্ধ করতেই বিমান বললো, "প্রিয়দা, আমাদের এক্ষুনি যাওয়া উচিত।"

"এত রাত্রে গিয়ে কী হবে?"

"মাদারিহাট নামটা শুনলে না?"

"তাতে কী হয়েছে?"

"আমি ভেবেছিলাম বুধ সিং বলছে, মা দাঁড়িয়ে—আসলে সে মাদারিহাটই বলতে চাইছিল, আমি বুঝতে পারিনি। সে চায় আমরা মাদারিহাট যাই।"

"ধ্যাৎ যতসব গাঁজাখুরি কথা! বলছি না, মাথা ঠাণ্ডা করে ঘুমোতো!"

বকুনি খেয়ে চুপ করে গেল বিমান। প্রিয়ব্রতও কিন্তু শুতে গেল

-না। বিছানার ধারে চিন্তিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ আবার ফিরে বললো, "চল্, তাহলে যাওয়াই যাক। গিয়ে দেখি তো।"

চটপট তৈরি হয়ে নিল ওরা। জিপের ড্রাইভার সারাদিন গাড়ি চালিয়ে ক্লান্ত। তাকে আর জাগানো হলো না। প্রিয়ব্রতই জিপ চালিয়ে চলে এলো থানায়। সেখানে সে কয়েকটা জরুরী নির্দেশ দিতে লাগলো। রেডিও টেলিফোনে বীরপাড়া আর মাদারিহাট থানায় খবর দিয়ে রাখতে হবে, সে যাতে সেখানে গিয়ে যে-কোনো সাহায্য পেতে পারে। জলপাইগুড়িতে এস পি-র কাছেও খবর দিয়ে রাখতে হবে।

ও-সি বললেন, "আপনারা দু'জনে শুধু যাবেন? সঙ্গে কনস্টেবল নেবেন না?"

প্রিয়ব্রত বললো, "তাঁর দরকার কী! পুলিশের দরকার হলে মাদারিহাট থানা থেকেই নিয়ে নেবো। ওদের জানিয়ে রাখুন। আর দেরি করে লাভ নেই।"

প্রিয়ব্রত দ্রুত জিপ চালিয়ে ধূপগুড়িতে এসে গ্যারেজের সেই ছেলেটাকে খুঁজে বার করলে। তার কাছ থেকে সব কথা শুনলো আবার। লোক তিনটের বর্ণনা নিল। একজন লম্বা মতন লোক আছে ঠিকই। মাদারিহাট যাবার রাস্তাটাও ঠিক মতন জেনে নিল। তারপর আবার স্টার্ট দিল গাড়িতে।

নিঝুম রাত, নির্জন রাস্তা। আকাশটাও মেঘলা, তাই জ্যোৎস্না নেই। দু' পাশে ফাঁকা মাঠ। মাঝে মাঝে দূরে মেঘের মতন জঙ্গল দেখা যায়।

প্রিয়ব্রত একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, "কী রে বিমান, তোর ভয় করছে না তো?"

"আমার ভয় করবে কেন?"

"এ-রাস্তায় প্রায়ই ডাকাতি হয়। অবশ্য পুলিশের জিপ দেখে

ডাকাতরা কাছে ঘেঁষবে না। হাতিও বেরোয় মাঝে মাঝে। এই বর্ষার সময়েই বেশী। দেখবি হয়তো রাস্তার মাঝখানে একটা দঁাতাল হাতি শুয়ে আছে!"

"ভালোই তো হবে। আমি কখনো বুনো হাতি দেখিনি।"

বিমান রাস্তার দু' পাশে জঙ্গলের দিকে খুব আশা করে তাকিয়ে রইলো, যদি একটা হাতি দেখা যায়। এমন ঝুপসি অন্ধকার যে এক-এক সময় মনে হয়, সত্যিই বুঝি সার বেঁধে কারা সব দঁাড়িয়ে আছে।

প্রিয়ব্রত খুব গম্ভীর। তাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। বিমান জিজ্ঞেস করলো, "কী ভাবছো, প্রিয়দা?"

"তোর কথাতেই এত দূর যাচ্ছি। কী জানি কী হবে। যে-কোনো লোকই খুব দরকার হলে একটা জিপ ভাড়া করতে পারে। যদি কারুর অসুখ করে, তাহলে যত টাকা লাগে তাও দিতে রাজী হবে। সুতরাং ঐ লোক তিনটে যে ডাকাতই হবে, তার কী মানে আছে!"

বিমান বললো, "যাই হোক না, বেড়ানো তো হচ্ছে!"

প্রিয়ব্রত ধমক দিয়ে বললো, "ছেলেমানুষি করিস না। এতবড় একটা দায়িত্ব রয়েছে আমার মাথায়, আর এর মধ্যেই তুই বেড়াবার কথা ভাবছিস!"

বীরপাড়া থানাতেও কোনো খবর পাওয়া গেল না। জিপের নম্বরটা অবশ্য প্রিয়ব্রত জোগাড় করেছে ধূপগুড়ি থেকে কিন্তু সেই নম্বরের একটা জিপ গেছে কিনা কেউ বলতে পারে না। পেট্রল পাম্পেও কোনো হদিস নেই।

এখান থেকে মাদারিহাট বেশী দূর নয়, আবার বেরিয়ে পড়লো প্রিয়ব্রত। জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। মাঝে-মাঝেই চা-বাগান আর জঙ্গল। নিশুতি রাত। কোথাও কোনো আওয়াজ নেই, শুধু জিপের গোঁ গোঁ আওয়াজ ছাড়া।

জিপের জোরালো হেড লাইটে দেখা গেল রাস্তার ধারে একটা

গাড়ি উল্টে আছে। প্রিয়ব্রত আস্তে আস্তে গাড়ির গতি কমালো। তারপর একদম থামিয়ে দিয়ে বলল, "জিপই তো মনে হচ্ছে। এরকম পর পর অ্যাকসিডেন্ট ?"



প্রিয়ব্রত গাড়ি থেকে নেমে ওল্টানো জিপটার দিকে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুটি ছায়ার মতন মানুষ জিপটার দু'পাশ থেকে নেমে ঘিরে ধরলো প্রিয়ব্রতকে। শক্ত একটা জিনিস দিয়ে তার মাথায় মারলো। ঝুপ করে মাটিতে পড়ে গেল সে।

বিমান তখন সবেমাত্র নেমে দাঁড়িয়েছে। ঐ দৃশ্যটা দেখে প্রথমেই তার মনে হলো—ইস্, প্রিয়দাটা এত ক্যাবলা, সঙ্গে রিভলবার রয়েছে, সেটা আগে বার করতে পারেনি!

তারপরই সে রাস্তা থেকে নেমে পাশের দিকে ছুটলো। লোক দুটো চেঁচিয়ে উঠলো, "ঐ আর-একটা পালাচ্ছে। ধর ধর।"

বিমান দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। লোক দুটো খুব কাছে এসে পড়েছে। তবু বিমান জানে, লোকগুলো কিছুতেই তাকে দৌড়ে হারাতে পারবে না। এই রকমভাবে খানিকটা দৌড়ে সময় কাটালে যদি প্রিয়দার জ্ঞান ফিরে আসে।

কিন্তু তখুনি একটা গুলির শব্দ হলো। লোক দুটো বিমানের দিকে গুলি ছুঁড়ছে। বিমান সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়লো। গুলির মুখে দৌড়োবার কোনো মানে হয় না!

লোক দুটো দৌড়ে এসে বিমানকে ধরে ফেললো। লম্বা মতন লোকটা বিমানের মুখটা দেখেই বললো, "এই তো সেই বিচ্ছুটা।"

বিমানও চিনতে পেরেছে। এই হচ্ছে সেই 'কী হচ্ছে কী', পার্কের পাশে যাকে দেখেছিল।

লম্বা লোকটা বললো, "ওঃ এই ছোঁড়াটা কম জ্বালিয়েছে?"

অন্য লোকটা গাঁট্টাগোট্টা। তাকেও বিমানের চিনতে অসুবিধে হলো না। ব্যাঙ্ক-ডাকাতির দিন এইরকম একটা লোককে সে দেখেছিল। আর একটা লোক কোথায়?

বিমানের কাঁধের কাছে কলার চেপে ধরে ওরা টানতে টানতে নিয়ে এলো রাস্তার ওপরে। লম্বা লোকটা তার গালে ঠাস করে এক চড় মারলো। বেঁটে লোকটা মারলো এক ঘুঁষি।

তারপর ওরা দু'জনে পালা করে মারতে লাগলো। ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগলো বিমানের নাক দিয়ে। লম্বা লোকটাই বেশী রাগের সঙ্গে মারছে।

বিমানের যেন একটা ক্ষীণ ধারণা ছিল, কেউ এসে তাকে এই সময়

বাঁচিয়ে দেবে। হয়তো বুধ সিং-এর প্রেতাত্মা। বুধ সিং যদি সত্যিই ভূত হয়ে থাকে, তাহলে এই সময় তাকে সাহায্য করতে আসবে না? কিন্তু কেউ তো এলো না। তাহলে সত্যিই চোখের ভুল?

এত মার সহ্য করা যায় না। এর থেকে অজ্ঞান হয়ে যাওয়াই ভালো। বিমান অজ্ঞানের ভান করে চোখ উল্টে ঝুপ করে পড়ে গেল মাটিতে।

লম্বা লোকটা তারপরেও বিমানের বুকে একটা লাথি মেরে বললো, "আপদ কোথাকার!"

একটু দূরে প্রিয়ব্রত তখনো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। বিমান চোখ পিট-পিট করে দেখতে লাগলো।

লোক দুটো উল্টে-পড়া জিপের কাছে গিয়ে জিনিসপত্র বার করে প্রিয়ব্রতর জিপে তুলতে লাগলো। চারটে বাক্স আর কয়েকটা প্যাকেট। প্যাকেটগুলো দেখে মনে হয়, নানারকম খাবার-দাবার আছে। ওরা তো তিনজন ছিল, বাকী লোকটা কোথায় গেল!"

একটু বাদেই বিমান দেখতে পেল তাকে। জিপটা সোজা একটা গাছে ধাক্কা মেরেছে। সামনের সীট থেকে ওরা একজনকে টেনে বার করলো। দেখেই বোঝা যায়, মরা।

লম্বা লোকটা ভারী গলায় বললো, "একেবারে শেষ হয়ে গেছে। ওঃ কী যে হলো!"

গাঁট্টাগোট্টা লোকটা বললো, 'আমি জীবনে এরকম কখনো দেখিনি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিনটে অ্যাকসিডেণ্ট। এ কখনো হয়?"

লম্বা লোকটা বললো, "শুধু তাই নয়! প্রত্যেকেই কীরকম চ্যাঁচাচ্ছিল? কিছু একটা দেখে ভয় পেয়েছে। কালকে ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা তো বেশ ভালো ছিল আমাদের দলে ভিড়িয়ে নেওয়া যেত। আমাদের সব কথায় রাজী হয়ে গেল। তারপরই লোকটা স্টিয়ারিং ছেড়ে এমন চেঁচাতে লাগলো—আমি তো ভেবেছিলাম, যশোর রোডেই আমরা সবাই অ্যাকসিডেণ্টে মরবো।"

"ঠিক যেন কে ওউর গলা চেপে ধরেছিল! নাকি পেট ব্যথা করছিল!"

"ডাবু আর ছেনোর বেলাতেও তাই।"

"ঠিক যেন ভূতুড়ে ব্যাপার।"

মোটা লোকটা হঠাৎ চেঁচিয়ে বললো, "ওরে বাবারে! এসব কী ব্যাপার! আমার দম আটকে আসছে। আমি আর পারবো না!"

লম্বা লোকটা তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, "এই, কী হচ্ছে কী? তুইও ঘাবড়ে গেলি নাকি? চল আর তো বেশী দূর নেই।"

"আমার ভয় করছে! সত্যিই খুব ভয় করছে।"

"আর ভয় নেই। নদাটা পার হলেই আমরা একেবারে সেফ্ হয়ে যাবো।"

ওরা গিয়ে প্রিয়ব্রতর জিপটায় উঠলো। মোটা লোকটা বললো, "এই দুটোকে কি ফেলে যাবো? মাথা-খারাপ নাকি? ওদের ঠিক মতন গতি করতে হবে।"

লম্বা লোকটা নেমে এসে প্রিয়ব্রত আর বিমানকে তুলে এনে ছুঁড়ে দিল জিপের পেছন দিকে। লোকটার গায়ে দারুণ জোর। এরপর লোকটা ওদের সঙ্গীর মৃতদেহটাও এনে রাখলো বিমানদের পাশে।

জিপটা চলতে শুরু করলো। একটু বাদেই বিমান বুঝতে পারলো, জিপটা বড় রাস্তা ছেড়ে একটা কাঁচা রাস্তা ধরেছে। অসম্ভব ঝাঁকুনি, মনে হচ্ছে যেন হাড়পাঁজরা সব গুঁড়ো হয়ে যাবে। পাশেই একটা মড়া পড়ে আছে বলে ঘেন্নাও করছে খুব। দু-একবার ছোঁয়া লাগছে, মড়ার শরীর খুব ঠাণ্ডা হয়। প্রিয়ব্রত তখনও অজ্ঞান। বিমানের ভয়, প্রিয়দাও মরে যায়নি তো?

সে ঠ্যালা দিয়ে প্রিয়ব্রতকে জাগাবার চেষ্টা করলো। কোনো সাড়া পেল না। তবে প্রিয়ব্রতর শরীরটা গরম। বিমান প্রিয়ব্রতর কোমরের কাছে হাত দিয়ে দেখলো রিভলবারটা পাওয়া যায় কিনা।

কিন্তু সেটা ওরা আগেই নিয়ে নিয়েছে।

গাড়ির গতি খুব বেশী নয়। বিমান ইচ্ছে করলে ওদের অলক্ষ্যে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়তে পারে। কিন্তু একা গিয়ে সে কী করবে? প্রিয়দার তা হলে কী হবে? দেখা যাক এরপর কী হয়!

কান খাড়া করে সে ওদের কথা শুনতে লাগলো। গাড়ি চালাচ্ছে মোটা লোকটা। সে এক সময় বললো, "বাপু, আমার গাড়ি চালাতে ভয় করছে। এ পর্যন্ত যে-ক'জন গাড়ি চালিয়েছে, তারাই গেছে।"

লম্বা লোকটা বললো, "ত্যাখ, আমি তো গাড়ি চালাতে জানি না, না-হলে আমিই চালাতুম।"

"আমার যদি কিছু হয়?"

"কী হবে! তুই ভয় পাচ্ছিস কেন?"

ভয় পাবো না? ট্যাক্সিওয়ালাটার কথা বাদ দে। আমাদের দলের দুটো লোক আজ গাড়ি চালাতে গিয়ে তো মরলো।"

"অ্যাকসিডেন্ট করলে কী করা যাবে?"

"সবাই এরকম অ্যাকসিডেন্ট করে একদিনে? বিলু তো সাঙ্ঘাতিক ভালো গাড়ি চালাতো। কোনোদিন অ্যাকসিডেন্ট করেনি। সাহসও ছিল দারুণ। সে হঠাৎ ভয় পেয়ে চ্যাঁচাতে লাগলো ময়নাগুড়ির কাছে।"

"আমার মনে হয় বিলুর কোনো অসুখ ছিল, আমরা জানতুম না"

"আমার তো মনে হয় ও চোখের সামনে কিছু দেখে ভয় পাচ্ছিল।"

"কী দেখবে? আমরা কেউ দেখলাম না, ও একা দেখবে!"

যাই হোক, আমিও যদি অ্যাক্সিডেন্টে মরি, তুই আমার বউ আর বাচ্চাদের দেখিস।"

"যাঃ কী যে বলছিস! আর তো সামান্য রাস্তা। গাড়ি এত আস্তে চলছে, কোনো অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে না। শুধু শুধু কতটা

দেরি হয়ে গেল। এখন নৌকোটা থাকলে হয়।"

"কোনোক্রমে যদি চুয়াপাড়া পৌঁছুতে পারি, তাহলে আমার টাকার ভাগ দিয়ে দিবি। আমি-এ'লাইন ছেড়ে দেবো একেবারে।"

"আর কে এ লাইনে থাকছে! যথেষ্ট হয়েছে।"

খানিকটা বাদেই জিপটা থামলো। ওরা দুজনে জিপ থেকে নেমেই কার নাম ধরে যেন ডাকলো। একটা সাড়াও পাওয়া গেল।

ভিজে-ভিজে হাওয়া আসছে। কাছেই নিশ্চয় নদী আছে। প্রথমে জিনিসপত্র নিয়ে গেল একজন। আর-একজন পাহারায় রইলো। তারপর লম্বা লোকটা এক-এক করে ওদের বয়ে নিয়ে গিয়ে রাখলো একটা নৌকায়।

নৌকোটা প্রায় সাধারণ নৌকোর মতন দেখতে হলেও তাতে মোটর লাগানো আছে। আর একজন লোক ভট্‌ভট্‌ শব্দে সেটায় স্টার্ট দিল। লম্বা লোকটা বললো, "দাঁড়াও, কয়েকটা পাথর নিয়ে আসি।"

নেমে গিয়ে সে কয়েকবারে বেশ কয়েকটা পাথর বয়ে নিয়ে এলো। তার পর বললো, "চলো।"

মাঝনদীতে এসে সে আবার বললো, "থামো!" তারপর বললো, "নিতাইকে এখানেই বিসর্জন দেওয়া যাক, কী বল?"

মোটা লোকটা বললো, "সেই ভালো!"

একটা পাথরের সঙ্গে দড়ি বেঁধে মৃতদেহটার সঙ্গে দড়িটার আর একদিক বাঁধা হলো। তারপর সবশুদ্ধ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো জলে।

লম্বা লোকটা দুঃখের সঙ্গে বললো, "যা নিতাই! আমরা কী করবো বল্, আমাদের তো দোষ নেই।"

মোটা লোকটা বললো, "এ দুটো কি এখনো অজ্ঞান হয়ে আছে, না মটকা মেরে আছে? এদের নিয়ে কী হবে?"

"ওদের ফেলে দে।"

মোটা লোকটা প্রিয়ব্রত আর বিমানের জুলপি ধরে টেনে দেখলো ওদের জ্ঞান আছে কি না। দারুন জোরে লাগলেও বিমান টু-শব্দ করলো না। মোটা লোকটা তখন প্রিয়ব্রতকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে গেল।

বিমান সব ঠিক করে ফেলেছে। এইরকমভাবে মরার চেয়ে যে-কোনো ঝুঁকি নেওয়া ভালো। সে কিছুতেই ওদের হাতে মরবে না।

বিমান উঠে বসলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রিয়ব্রত তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে একটা দারুণ জোরে ঘুঁষি কষালো মোটা লোকটার দিকে। ঘুঁষি খেয়ে লোকটা ছিটকে পড়ে গেল নৌকোর মাঝখানে। তারপরই প্রিয়ব্রত এগিয়ে গেল লম্বা লোকটার দিকে।

লম্বা লোকটির হাতে রিভলবার। সে বিচ্ছিরিভাবে হেসে বললো, "ঠিক আছে, আগে শেষ করে দি, তারপর জলে ফেলবো—দুটোকে এক সঙ্গে···"

লম্বা লোকটার নিষ্ঠুর মুখ দেখেই বোঝা যায়, সে সত্যিই গুলি করবে। প্রিয়ব্রত থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

তখনই বিমান দেখতে পেল লম্বা লোকটার পাশে একটা ছায়ামূর্তি। বিমান চিনতে পারলো, বুধ সিং।

বিমান আর দেরি করলো না, লাফিয়ে পড়লো নদীতে।

লম্বা লোকটা একটু যেন অবাক হলো। নদীটার নাম তোর্সা। বর্ষার সময় এই নদী ভয়ংকরী হয়ে ওঠে। এতে কেউ ইচ্ছে করে লাফিয়ে পড়তে পারে?

লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "মর্! মর্!

জলে পড়ে বিমান অনেকখানি ডুবে গেল। তারপর আবার ভেসে উঠলো ভুস্ করে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে একটা চিৎকার শোনা গেল : বড়োবাবু, বড়োবাবু, হোঁশিয়ার!

জলের মধ্যেও বিমানের শরীরটা কেঁপে উঠলো ভয়ে। তাহলে সে বুধ সিংকে ঠিকই দেখেছে।

নৌকোর ওপর ঠিক তখনই কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো দারুণ ভয় পেয়ে। কে যেন হুড়মুড় করে পড়ে গেল। তারপরেই রিভলবারের গুলির শব্দ। বিমান আবার ডুব দিল।

জলে খুব স্রোত। টানের মুখে পড়লে কোথায় নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। কিন্তু বিমান সাঁতারে চ্যাম্পিয়ান, জলকে সে ভয় পায় না।

জলের মধ্যে কী একটা জিনিস যেন তোলপাড় করছে। এই জলে কি কুমির থাকে? তাহলেই সেরেছে! কে যেন বিমানের নাম ধরে ডাকছে। প্রিয়ব্রতর গলা। এমন সময় ভুস করে বিমানের সামনেই কী যেন একটা মাথা তুললো। কুমির নয়, মানুষ। প্রিয়ব্রতও কি জলে পড়েছে! বিমানের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো প্রিয়দা তো ভালো সাঁতার জানে না। অমনি সে তাকে ধরতে গেল। কিন্তু ধরতে পারলো না। লোকটা একটা ভয়ের শব্দ করে ডুবে গেল জলের মধ্যে।

এবার নৌকার ওপর থেকে প্রিয়ব্রতর গলা শোনা গেল, বি-মা-ন! বি-মা-ন? ছপ ছপ করে সাঁতরে সে এগুতে লাগলো নৌকার দিকে। কাছে আসতেই প্রিয়ব্রত তার হাত ধরে তুলে নিল।

মোটা লোকটার হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধেছে প্রিয়ব্রত। নৌকোর মোটর যে চালাচ্ছিল, সে বসে আছে আড়ষ্ট হয়ে, লম্বা লোকটা নেই।

বিমান জিজ্ঞেস করলো, "সে কোথায় গেল?"

প্রিয়ব্রত বললো, "সেও তো জলে পড়ে গেছে।"

"কী করে?"

"তা তো বুঝলাম না! আমি ভাবলাম লোকটা আমাকে মেরেই ফেলবে। হঠাৎ লোকটা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, তারপরই ছিটকে পড়ে গেল। বোধ-হয় পা পিছলে পড়ে গেছে।"

বন্দী মোটা লোকটা আস্তে আস্তে বললো, "আমাদের আর-দুজ'ন লোকও ঐ ভাবে—ওঃ ওঃ ওঃ!"

লোকটা কাঁদতে আরম্ভ করেছে। একটা নিষ্ঠুর ডাকাতকে এরকম কাঁদতে দেখলে অদ্ভুত লাগে '

বিমান জিজ্ঞেস করলো, "প্রিয়দা, তুমি লম্বা লোকটার পাশে আর কারুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলে ?"

"না তো! কে ?"

"কোনো শব্দও শোননি ?"

"না! তুই কার কথা বলছিস ?"

বিমান চুপ করে গেল। তার খুব ক্লান্ত লাগছে, ইচ্ছে করছে শুয়ে পড়তে। মাত্র কয়েক মিনিট আগেও মনে হয়েছিল মৃত্যু একেবারে চোখের সামনে এসে গেছে।

প্রিয়ব্রত মোটা লোকটার টর্চটা নিয়ে নদীতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। একবার সে চেঁচিয়ে উঠলো, "ঐ যে, ঐ যে, ঐখানে…"

বিমান জিজ্ঞেস করলো, "প্রিয়দা, তুমি ওর নাম জানো ?"

"ওকে তো দেখেই চিনেছি। ঐ ঘনশ্যাম আগে একবার জেল খেটেছে।"

"আমি ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম!

বেশ খানিকটা দূরে সাদা মতন কিছু একটা দেখা গেল। বোধহয় সেই লম্বা লোকটার জামা। ঢেউয়ে ওলোট-পালোট খাচ্ছে। নৌকোটা তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে। কিন্তু আর কিছুই দেখা গেল না। অনেক খোঁজা-খুঁজি করেও আর সন্ধান পাওয়া গেল না ঘনশ্যামের। সে স্রোতের টানে পড়ে গেছে। কোথায় থামবে কে জানে!

মোটা লোকটা তখন ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করেছে। প্রিয়ব্রত তাকে একটা ধমক দিল। তবু সে কান্না থামলো না। হাউ হাউ করে বলতে লাগলো, আমাকে বাঁচান। ওরা সবাই গেল। আমাকে বাঁচান। আমি এখন থেকে কুলিগিরি করবো!

বিমান নৌকোর পাটাতনের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো।

চোখের সামনে বিরাট আকাশ। আবছা আবছা মেঘ। নদীর স্রোতের কলকল শব্দ। ঘুম এসে যাচ্ছে। তখনও সে ভাবতে লাগলো, বুধ সিংকে সে একাই দেখতে পেল কেন? নৌকোর ওপর সে বুধ সিংকে স্পষ্ট দেখেছে—লম্বা লোকটাকে মারবার জন্য হাত তুলেছিল। প্রিয়দা কেন দেখতে পেল না?

———